সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ২৯-৩০
০৪ মে ২০২৬, সোমবার

বালাদিল আমীন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংস্কৃতির আলোয়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

২৯-৩০ সংখ্যা
০৪ মে-২০২৬ ঈসায়ী
২১ বৈশাখ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৬ যিলক্বদ-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

- মণির খনি: ০২
- সম্পাদকীয়– হজ্জ: মুসলিম উম্মাহর বিভেদে বাস্তবতায় ঐক্যের চেতনা ...০৪
- দারসুল কুরআন– মুখ ও অন্তরের ভিন্নতা: একটি কুরআনিক বিশ্লেষণ
  আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫
- দারসুল হাদীস: ব্যক্তির সম্মুখ প্রশংসা করা
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- ইসলামী প্রবন্ধ: সলাতে টাখনুর সাথে টাখনু মিলানো
  আমির হামজা বিন আব্দুল মালেক- ১১
- জান্নাতে একটি ঘর
  হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী- ১৪
- উম্মাহর জাগরণ: ধর্মের অনুসরণ
  আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ১৬
- আলোকিত জীবন– ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম
  ড. আহমাদুল্লাহ- ১৯
- ক্বাসাসুল হাদীস: কিয়ামতের দিন রাসূল (ﷺ)-ই একমাত্র সুপারিশকারী
  আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৪
- হৃদয়কথন: সায়রে সমর্পণ — আব্দুল মোমেন- ২৬
- সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি: ওলিমার কিছু সুন্নাত — জান্নাতুল মহল- ২৯
- ভ্রমণ কাহিনী: গৃহে ফেরা — মো. তানভির ইসলাম- ৩১
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান: জবাব — সুপ্ত রায়হান সজিব- ৩৩
- কবিতা ৩৪
- জমঈয়ত সংবাদ ৩৫
- স্বাস্থ্য সচেতনতা ৩৭
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৯
- প্রচ্ছদ রচনা– বালাদিল আমীন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
  আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৭

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

মণির খনি / منجم جواهر

আল্লাহ তা'আলার বাণী

❁ ﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

✽ "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালোবাসেন।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান: ১৩৪)*

❁ ﴿وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ﴾

✽ "আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।" *(সূরা ফুস্সিলাত: ৩৪)*

❁ ﴿وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾

✽ "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপনতাও করে না, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।" *(সূরা আল-ফুরক্বা-ন: ৬৭)*

❁ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

✽ "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে তার অধিবাসীদের সম্প্রীতিসম্পন্ন অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করে না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" *(সূরা আন্-নূর: ২৭)*

❁ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ﴾

✽ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো; নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ্ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" *(সূরা আল-হুজুরা-ত: ১২)*

❁ ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

✽ "নিশ্চয় আল্লাহ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহসান (সদাচরণ), ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" *(সূরা আন্-নাহ্ল: ৯০)*

❁ ﴿وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا﴾

✽ "আর রহ্মা-ন-এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম।" *(সূরা আল-ফুরক্বা-ন: ৬৩)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

❁ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

❖ "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া করেন না।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৯৭ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৩১৯)*

❁ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

❖ "যে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৭৪)*

❁ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

❖ "নিশ্চয়ই বান্দা কখনো এমন কথা বলে ফেলে যার (ভালো-মন্দ) সম্পর্কে সে চিন্তা করে না, অথচ সেই এক কথার কারণে সে জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়, যার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৭৭)*

❁ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ.

❖ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: "কার সাথে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করব?" নবী (ﷺ) বললেন: "তোমার মা।" তারপর, তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর, তিনি বললেন, তোমার মা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৭১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৪৮)*

❁ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ.

❖ "ন্যায়পরায়ণরা (কিয়ামতের দিন) মহান আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরে থাকবে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৭)*

❁ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

❖ "যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭ ও ৪৮)*

❁ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

❖ "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫৫৯)*

❁ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

❖ "মু'মিনদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।" *(সহীহ আবূ দাউদ- হা. ৪৬৮২)*

❁ اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

❖ "তুমি পৃথিবীর মানুষের প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশের মালিক তোমার প্রতি দয়া করবেন।" *(জামে' আত্-তিরমিযী- হা. ১৯২৪)*

❁ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ.

❖ "যে রাগ দমন করে, অথচ সে তা প্রকাশ করতে সক্ষম আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে বলবেন হুরদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তুমি বেছে বা নির্বাচন করে নিতে পারো।" *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৮৬)*

❁ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ.

❖ "নিশ্চয়ই রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দিয়ে।" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৮৪)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

হজ্জ: মুসলিম উম্মাহর বিভেদ বাস্তবতায় ঐক্যের চেতনা

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। হজ্জ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সর্ববৃহৎ বার্ষিক মহাসম্মেলন। মানবিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের এক জীবন্ত প্রতীক। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা ভিন্ন ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থানের মানুষ- সকলেই যখন একসাথে সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" বলতে বলতে বায়তুল্লাহ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন, তখন সেখানে এক অনন্য সমতার দৃশ্য ফুটে ওঠে। এই দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়- সব বিভাজনের উর্ধ্বে আমাদের একটি বড় পরিচয় আছে, আর তা হলো 'মুসলিম উম্মাহ'।

ইসলামে 'উম্মাহ' ধারণা কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা বা জাতিগত পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বিশ্বাসভিত্তিক এক বন্ধন, যার কেন্দ্রবিন্দু মহান আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শ। হজ্জ সেই আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন, যেখানে ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল, সাদা-কালো- সবাই একই কাতারে দাঁড়ায়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি এমন এক প্রক্রিয়া, যা মানুষের ভেতরের মর্যাদা ও সমতার অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে।

কিন্তু এই আদর্শিক চিত্রের বিপরীতে বাস্তবতা আজ ভিন্ন। মুসলিম সমাজে বিভাজন এখন নানা রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি শুধু শিয়া-সুন্নী বা মাযহাবভিত্তিক মতভেদেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং একই 'আক্বীদাহ্ ও মানহাযের অনুসারীদের মধ্যেও দলাদলি, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা স্পষ্ট। এখানে সমস্যা মতানৈক্য নয়, কারণ ইসলামে মতপার্থক্য (ইখতিলাফ) স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য বিষয়, সমস্যা হলো সেই মতপার্থক্যকে বিদ্বেষে রূপ দেওয়া, যা শেষ পর্যন্ত বিভক্তি বা তাফাররুকের কারণ হয়।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ। দাওয়াহ, যার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরে ঈমান জাগ্রত করা, তা অনেক ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তা, অনুসারী বৃদ্ধি এবং আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণা, ব্র্যান্ডিং এবং প্রতিযোগিতামূলক দাওয়াহ কার্যক্রম এই প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। ফলে আন্তরিকতা কমে যাচ্ছে, আর ঐক্যের বদলে বিভাজনের ক্ষত গভীর হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা- ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মতভেদের ক্ষেত্রে 'আদাবুল ইখতিলাফ' চর্চা করতে হবে। আমাদের পূর্বসূরি আলেমরা মতভেদ করতেন, কিন্তু একে অপরের প্রতি সম্মান বজায় রাখতেন- এই দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রাখতে হবে। তৃতীয়ত, দাওয়াহকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে বের করে আল্লাহকেন্দ্রিক করতে হবে, যাতে লক্ষ্য হয় কেবল তাঁর সন্তুষ্টি; জনপ্রিয়তা, প্রভাব বিস্তার কিংবা সম্পদের প্রাচুর্য গড়ার উদ্দেশ্যে নয়।

হজ্জ আমাদের যে শিক্ষা দেয়- ত্যাগ, বিনয়, সাম্য ও ঐক্য- তা যদি আমরা শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিজেদের জীবন, সমাজ ও কর্মে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে বিভেদের অনেকটাই দূর করা সম্ভব। বাহ্যিক ঐক্য নয়; বরং অন্তরের ঐক্যই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, হজ্জের এই মহৎ শিক্ষা যদি আমাদের চিন্তা ও কাজে প্রতিফলিত হয়, তাহলে মুসলিম উম্মাহ তার হারানো ঐক্য, শক্তি ও সৌন্দর্য আবার ফিরে পেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

درس القرآن / দারসুল কুরআনঃ

মুখ ও অন্তরের ভিন্নতা: একটি কুরআনিক বিশ্লেষণ

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ○ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুতঃ তারা নিজেরা নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।"[১]

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াত তিনটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের সর্ববৃহত্তম সূরা, সূরা আল-বাক্বারাহ্ হতে চয়ন করা হয়েছে। আয়াতত্রয় সূরা আল-বাক্বারাহ্'র আট, নয় ও দশ নং আয়াত।

প্রেক্ষাপট ও পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর যোগসূত্র

সূরা আল-বাক্বারাহ্'র প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিন মুত্তাকীদের বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর দু'টি আয়াতে কাফিরদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর এ আয়াতত্রয় হতে পরবর্তী কয়েকটি আয়াত পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলিম জাম'আতের মারাত্মক ক্ষতিকারক কপটচারী মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। মুনাফিক্ব সর্দার 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে সালুল এবং ইবনু কুশাইব প্রমুখ মুনাফিক্বদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের ধোকাবাজীর কথা বর্ণনাকরতঃ তাদের অন্তরে লালিত ব্যাধির প্রসঙ্গ টেনে নিজেদের অপকর্ম ও গোয়ার্তুমির পক্ষে সাফাই গাওয়ার প্রবণতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অহমিকাবশতঃ বড় বড় মিথ্যা দাবির অসারতার পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নিফাক্ব ও এর প্রকারভেদ

'নিফাক্ব' (نفاق) একটি অরবি শব্দ, যার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– ভণ্ডামি বা দ্বিমুখী নীতি, চালু করা, গোপন করা, অস্পষ্ট করা ও কপটতা ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলা হয়– Hypocrisy। আর এই নিফাক্বে লিপ্ত মানুষকে "মুনাফিক্ব" বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে 'নিফাক্ব' দুই প্রকার। যথা- (১) বিশ্বাসের নিফাক্ব ও (২) কর্মের নিফাক্ব। প্রথম প্রকারের মুনাফিক্ব তো চির জাহান্নামী এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিক্ব জঘন্যতম পাপী।

তাফসীর (বিশ্লেষণ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়।"

সূরা আল-বাক্বারাহ্'র প্রথম ৪টি আয়াত মু'মিনদের ও পরবর্তী ২টি আয়াত কাফিরদের এবং এ আয়াত তিনটি থেকে পরের ১০টি আয়াত কপটবিশ্বাসী মুনাফিক্বদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

এ আয়াতটি এমন কিছু মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যারা আসলে মুনাফিক্ব এবং তাদের ঈমান শুধু মুখে, অন্তরে নয়। ঈমানদারদেরকে প্রতারিত করার জন্য তারা মৌখিকভাবে ঈমানের প্রকাশ করে, তারা আসলে মু'মিন নয়, মুনাফিক্ব। তাদের ভিতরে এক আর বাইরে আরেক। তাদের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ কপটতা ব্যতিত আর কিছুই নয়। তারা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এরূপ

* *সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৮-১০।*

ভণ্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের জন্য সবসময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে ও ষড়যন্ত্র করে। তাদের অন্তর তো হলো ঈমান থেকে বঞ্চিত, তারা শুধু ঈমানদারদেরকে প্রতারিত করার জন্য ঈমানের দাবি করে। কিন্তু তারা আস্থা লাভ করতে পারে না। তারা ইসলামের জন্য কাফির ও মুশরিকদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। কেননা, আল্লাহদ্রোহীতায় কাফিরদের ভূমিকা সুস্পষ্ট, ফলে কাফিরদের থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব। কিন্তু মুনাফিক্বদের ভূমিকা অস্পষ্ট, তাই তাদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা কষ্টকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

অর্থ- "এরা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে আর এরা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে, অতএব তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ﴾

"তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুতঃ তারা নিজেরা নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।"

তারা যতই চেষ্টা করুক মহান আল্লাহকে প্রতারিত করতে পারবে না কেননা তিনি সর্বব্যাপারে জ্ঞাত, সমস্ত ধোঁকা ও প্রতারণার উর্ধ্বে। আর তারা নবী ও ঈমানদারদেরকেও স্থায়ীভাবে ধোঁকার মধ্যে রাখতে পারবে না কেননা তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে মু'মিনদেরকে মুনাফিক্বদের বিষয়ে অবহিত করে দিবেন। প্রকৃত পক্ষে মুনাফিক্বদের ধোঁকা ও প্রতারণার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ওপরই পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ﴾

"নিশ্চয় মুনাফিক্বরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু তিনি তাদেরকে তাদের সেই প্রতারণায় প্রত্যার্পন করেন।"[৩]

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মুনাফিক্বরা মহান আল্লাহকে ও মু'মিনদেরকে কেমন করে ধোঁকা দিবে? ওরা তো মনের বিপক্ষে যা কিছু করে থাকে তা তো শুধু তাদের নিরাপত্তার খাতিরে। তবে উত্তরে বলা যাবে যে, যে ব্যক্তি কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরকম কথা বলে আরবী ভাষায় তাকে مخادع বা প্রতারক বলা হয়।

ইবনু জুরাইয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– তারা (মুনাফিক্বরা) 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' কালিমাটি মুখে প্রকাশ করে জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে আসলে এই কালিমাটি তাদের অন্তরে স্থান পায় না।

ক্বাতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– মুনাফিক্বদের অবস্থা এই যে, তাদের মুখ পৃথক, অন্তর পৃথক, কাজ পৃথক, বিশ্বাস পৃথক, সকাল ও সন্ধ্যা পৃথক, তারা ঐ নৌকার মতো যে বাতাসে কখনও এদিক ঘুরে কখনও আবার ওদিক ঘুরে।

ভিন্ন ক্বিরআতঃ কোনো কোনো ক্বারী يُخٰدِعُوْنَ-কে يَخْدَعُوْنَ পড়েছেন আবার কেউ কেউ يُخٰدِعُوْنَ পড়েছেন। দু'টি ক্বিরআতেরই ভাবার্থ এক ও অভিন্ন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ﴾

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।"

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে" –এখানে ব্যাধি বলতে কুফ্‌রী ও নিফাক্বের (হৃদয়জাত) ব্যাধিকে বুঝানো হয়েছে। যায়েদ ইবনু আসলাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, এখানে ব্যাধি-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় রোগ, শারীরিক রোগ নয়। ইসলাম সম্পর্কে তাদের সংশয়-সন্দেহজনিত একটি বিশেষ রোগ ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই রোগ বাড়িয়ে দিলেন। এই রোগ-ব্যাধি যদি সরানোর চিন্তা না করা হয়, তাহলে তা বাড়তে থাকে। অনুরূপ মিথ্যা বলা মুনাফিক্বদের একটি নিদর্শন; যা হতে দূরে থাকা অপরিহার্য। "অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন"-এর অর্থ এই যে, তারা যেহেতু তাদের অন্তরকে ব্যধি দিয়ে কলুষিত করেছে সেহেতু তাদের এই কলুষতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। এখানে মূলতঃ যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর যুল্‌ম করেন না। কেউ খারাপ পথে চলতে না চাইলে তাকে সে পথে জোর করে চলতে বাধ্য করেন না। এ কথা কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এসেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

[২] *সূরা আল-মুজাদালাহ্: ১৬।*
[৩] *সূরা আন্-নিসা: ১৪২।*

﴿وَ نُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ نَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ﴾

অর্থ: "তারা যেমন প্রথমবারে ঈমান আনেনি, তেমনি আমিও তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেব।"[৪]

এ অবস্থায় ঈমান ও তাদের মাঝে বাঁধা এসে যাবে, তারা সঠিক পথে চলতে সক্ষম হবে না। এটা মহান আল্লাহর ইনসাফেরই দাবী। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা তাদের নিজের ওপর অপরাধ করে, তারা মহান আল্লাহর অবারিত রহমত দর্শনের পরও তাতে অবগাহন না করে, সঠিক পথ দেখানোর পরেও তাতে না চলার কারণে তিনি তাদের থেকে সেটা গ্রহণ করার তাওফীক্ব উঠিয়ে নেন। অন্যত্র তিনি বলেন–

﴿وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ﴾

অর্থ: "আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে। আর তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।"[৫]

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের খারাপ কর্মকাণ্ডের কারণেই তাদের পরিণতি খারাপ হয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। কারণ হিসেবে আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে–

﴿بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ﴾

"তাদের মিথ্যাবাদীতার কারণে।"

মুনাফিক্বদের চরিত্রে মিথ্যার দু'টি রূপ। **এক-** তারা নিজেরা মিথ্যা বলত। **দুই-** তারা অন্যকে মিথ্যাবাদী মনে করত। আয়াতের এ অংশ থেকে বুঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই মুনাফিক্বদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফ্র ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফ্র ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদই হচ্ছে মিথ্যা। তাই আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে বলেছেন–

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ﴾

অর্থ: "তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকো।"[৬]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, মিথ্যা ঈমানকে দূর করে দেয়।"[৭]

আমাদের জীবনে এর শিক্ষা

১. মুখ ও অন্তরের মিল রাখা (সততা): ঈমান বা বিশ্বাস কেবল মুখে দাবি করার বিষয় নয়; বরং তা অন্তরে লালন করতে হয়। মুখে এক আর অন্তরে অন্য কিছু রাখা মুনাফিক্বি, যা থেকে আমাদের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

২. মহান আল্লাহর সাথে প্রতারণা অসম্ভব: কেউ চাতুরির মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারলেও মহান আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব। যারা দ্বিমুখী আচরণ করে, তারা আসলে নিজেদেরই ধোঁকা দেয়, যদিও তারা তা বুঝতে পারে না।

৩. মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা: অন্তরের কুটিলতা, হিংসা বা নিফাক একটি মারাত্মক 'ব্যাধি' (রোগ)। এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে নিয়মিত আত্মশুদ্ধি এবং কুরআনের দিকনির্দেশনা মেনে চলা প্রয়োজন।

৪. মিথ্যা বলা পরিহার করা: ১০ নম্বর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ হলো তাদের 'মিথ্যাচার'। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা মু'মিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৫. সচেতনতা ও বিবেকবোধ: মুনাফিক্বরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করে প্রতারণা করে, কিন্তু কুরআন বলছে তারা 'নির্বোধ' (তারা তা অনুভব করে না)। আমাদের প্রতিটি কাজ করার আগে বিবেক দিয়ে চিন্তা করা উচিত যে, আমরা সঠিক পথে আছি কি না।

৬. পাপের ভয়াবহতা (ক্রমাগত বৃদ্ধি): মানুষ যখন পাপে লিপ্ত হয় এবং তাওবাহ্ করে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সেই পাপের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দেন। তাই ছোট কোনো ভুল বা অন্তরের কালিমা দেখা দিলেই দ্রুত তাওবাহ্ করা জরুরি।

৭. যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয়: এই আয়াতগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের সাথে প্রতারণা বা কপটতার শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। পরকালের জবাবদিহিতার ভয় আমাদের বর্তমান জীবনকে সংশোধন করতে সাহায্য করে।

---

[৪] *সূরা আল-আন'আম: ১১০।*
[৫] *সূরা আত্-তাওবাহ্: ১২৫।*
[৬] *সূরা আল-হাজ্জ: ৩০।*
[৭] *মুসনাদে আহমাদ- ১/৫।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস:

ব্যক্তির সম্মুখ প্রশংসা করা

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ (ﷺ) رَجُلًا يُثْنِيْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ، ظَهْرَ الرَّجُلِ.

সরল বঙ্গানুবাদ

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে এবং তাকে নিয়ে অতিরিক্ত প্রশংসা করতে শুনলেন। তখন নবী (ﷺ) বললেন, তোমরা তো তাকে ধ্বংস করে দিলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে।[৮]

হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রিয়নবী একদিন এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করতে দেখে তিনি বললেন,

أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ، ظَهْرَ الرَّجُلِ.

'তোমরা তো তাকে ধ্বংস করলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে।' মূলতঃ এর মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের মুখের উপরে প্রশংসা করা কত ভয়ংকর। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাক্ষাতে প্রশংসা করে চাটুকারিতা করে। তবে শরিয়তের মূলনীতির মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তির প্রশংসা করা বৈধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা একাধিক নবীর প্রশংসা করেছেন। যেমন- ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

"তিনি হবেন আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, প্রবৃত্তি দমনকারী এবং পুণ্যবান নবীদের একজন।"[৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও তাঁর সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তিনি বলেন,

مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ.

'তুমি যে পথে চলো শয়তান কখনো সে পথে চলে না; বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।'[১০]

প্রশংসা যদি কেউ করতেই চায় তাহলে কিভাবে করবে এ সম্পর্কেও হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَجُلًا أَثْنَى عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ)، فَقَالَ لَهُ: قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ أَحْسِبُهُ، كَمَا يُرِيْدُ أَنْ يَقُوْلَ، وَلَا أُزَكِّيْهِ عَلَى اللهِ.

আব্দুর রাহমান ইবনু আবূ বকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর সামনে অন্য লোকের প্রশংসা করলে তিনি লোকটিকে তিনবার বলেন, তুমি তো তোমার সঙ্গীর গলা কেটে দিলে। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমাদের কেউ একান্তই তার সঙ্গীর প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে, আমি তাকে এরূপ মনে করি, তবে মহান আল্লাহর নিকট তাকে নির্দোষ মনে করি না।[১১] মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ.

তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ, সম্মুখ প্রশংসা হচ্ছে কাউকে জবাই করার শামিল।[১২] আবূ বাকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর সম্মুখে অন্য জনের প্রশংসা করছিল। তখন নবী (ﷺ) প্রশংসাকারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ كَذَا وَكَذَا.

তুমি ধ্বংস হও! তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। তুমি ওর ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছো। এ কথা রাসূল (ﷺ) কয়েক বার বলেছেন। তবে যদি তোমাদের কেউ অবশ্যই কারোর প্রশংসা করতে চায় তাহলে সে যেন বলে– আমি ধারণা

---

* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[৮] আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ৩৩৪।

[৯] সূরা আ-লি-'ইমরান: ৩৯।

[১০] সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৯৪।

[১১] সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮০৫।

[১২] সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮১১।

করছি, তবে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আমি মহান আল্লাহর উপর কারোর পবিত্রতা বর্ণনা করতে চাই না। আমি ধারণা করছি, সে এমন এমন। সে ও ব্যক্তির ব্যাপারে ততটুকুই বলবে যা সে তার ব্যাপারে ভালোভাবেই জানে।[১৩]

এমনকি রাসূল (ﷺ) কাউকে কারোর সম্মুখে প্রশংসা করতে দেখলে তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাম্মাম (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করলে মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারেন এবং বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ.

যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে তখন তোমরা তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে।[১৪]

রাসূল (ﷺ) কারোর সম্মুখে তার ভূয়সী প্রশংসা করতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যেন তার প্রশংসায় কোনো রকম অমূলক বাড়াবাড়ি করা না হয় এবং সেও ব্যক্তিগতভাবে নিজ আত্ম-অহমিকা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

অবৈধ প্রশংসা: মানুষ প্রশংসা পেতে পছন্দ করে। কখনো বা অন্যের প্রশংশা করে প্রশান্তি কুড়িয়ে নেয়। ইসলামে ব্যক্তি প্রশংসা বৈধ। তবে মানুষের কল্যাণার্থে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রশংসা নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো–

আত্মপ্রশংসা: আত্মপ্রশংসা অহংকারের কারণ হয়। অহংকার ধ্বংস ডেকে আনে। তাই ইসলাম আত্মপ্রশংসা নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى﴾

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না, তিনিই ভালো জানেন কে আল্লাহভীরু।"[১৫]

অতি প্রশংসা: বাড়াবাড়ি সব ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। প্রশংসার ক্ষেত্রেও তাই। অতি প্রশংসায় মিথ্যার মিশ্রণ লুকায়িত থাকে। স্বয়ং নবীজি (ﷺ) নিজের ক্ষেত্রেও অতি প্রশংসা পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তোমরা তার চেয়ে উঁচু মর্যাদা আমাকে দাও, তা আমি পছন্দ করি না।'[১৬]

সম্মুখে প্রশংসা: সামনাসামনি প্রশংসা দ্বারা অহমিকা সৃষ্টি হয়। এমন প্রশংসাকে হাদীসে ধ্বংসের কারণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বলেন,

أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ، ظَهْرَ الرَّجُلِ.

'তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে বা তোমরা তার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেললে।'[১৭]

প্রশংসাপ্রত্যাশীদের প্রশংসা: সব নেক কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। মানুষের সস্তা প্রশংসা প্রত্যাশা করা অনুচিত। প্রশংসাপ্রত্যাশীদের আল্লাহ তা'আলা কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾

"যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে– এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। আর তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[১৮]

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির প্রশংসা: প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির প্রশংসা করা নিষিদ্ধ। এমন ব্যক্তির প্রশংসা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

তোমরা মুনাফিক্বকে আমাদের নেতা বলে সম্বোধন কোরো না। যদি তা করো, তবে তোমরা তোমাদের মহান রবকে অসন্তুষ্ট করলে।'[১৯]

তোষামোদ ও চাটুকারিতা: তোষামোদী ও চাটুকারিতায় অবৈধ স্বার্থ নিহিত থাকে। হাদীসে চাটুকারিতাকে হত্যাতুল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ.

'তোমরা পরস্পর অতি প্রশংসা তথা তোষামোদী ও চাটুকারিতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তা হত্যাতুল্য।'[২০]

যাদের প্রশংসা করা বৈধ: সদুদ্দেশ্যে সীমার মধ্যে থেকে একজন মু'মিন অপর মু'মিনের প্রশংসা করতে পারে। যেমন-

১. অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা আদায়: ইসলাম অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা আদায়ে উৎসাহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'যে

---

[১৩] *বুখারী- হা. ২৬৬২, ৬০৬১; মুসলিম- হা. ৩০০০; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮০৫; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮১২।*
[১৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩০০২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮০৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮১০।*
[১৫] *সূরা আন্-নাজম: ৩২।*
[১৬] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২১৪১।*
[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৬৩।*
[১৮] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৮৮।*
[১৯] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯৭৭।*
[২০] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৭৪৩।*

মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে (যথাযথভাবে) মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে না।'[২১]

২. ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া: ব্যক্তিকে ভালো কাজে উৎসাহিত করতে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন,

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ.

'আব্দুল্লাহ কতই না উত্তম ব্যক্তি যদি সে তাহাজ্জুদ আদায় করত।[২২]

২. প্রাপ্য অধিকার লাভ: মানুষ যেন তার প্রাপ্য অধিকার, মর্যাদা ও অবস্থান লাভ করে এ জন্য প্রশ্ন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর এক কন্যা বলেছিলেন,

﴿يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ﴾

"হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। কেননা আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"[২৩]

ভারসাম্যহীন প্রশংসার শাস্তি: পবিত্র কুরআনে ভারসাম্যহীন নিষিদ্ধ প্রশংসার ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে,

﴿وَ لَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ﴾

"যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।"[২৪]

অতি প্রশংসার মুখোমুখি হলে করণীয়: কোনো ব্যক্তি যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অতি প্রশংসার মুখোমুখি হয়, তবে তার জন্য করণীয় হলো–

১. প্রতারিত না হওয়া : প্রশংসামূলক কথায় মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের সতর্ক বাণী হলো–

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ﴾

"আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।"[২৫]

২. প্রশংসাকারীকে সতর্ক করা: মহানবী (ﷺ) বলেন, 'যখন তোমরা কোনো অতি প্রশংসাকারীর মুখোমুখি হবে, তখন তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।'[২৬]

৩. মহান আল্লাহর প্রশংসা করা: অতি প্রশংসার মুখোমুখি হলে মু'মিন আল্লাহমুখী হয় এবং তার প্রশংসায় লিপ্ত হয়।

প্রশংসায় সীমা রক্ষা করা জরুরি: ইসলামে ব্যক্তি প্রশংসা বৈধ, তবে তা অবশ্যই সীমা রক্ষা করে করতে হবে। এমনকি নবী-রাসূলের প্রশংসার ক্ষেত্রে ইসলাম সীমালঙ্ঘন অনুমোদন করে না। মহানবী (ﷺ) বলেন,

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

"তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না, যেমন- 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি মহান আল্লাহর বান্দা। তাই বলো– আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[২৭]

সামনা সামনি কেউ প্রশংসা করলে করণীয় কি?

সেক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি নিম্নের দু'আটি পাঠ করতে পারেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তারা যা বলছে সে ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও করো না এবং যে বিষয়ে তারা জানে না, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করে দাও'। জনৈক সাহাবী এ দু'আটি পাঠ করতেন।'[২৮] তবে প্রশংসাকৃত ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং এতে তার কল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে প্রশংসা করা যেতে পারে।[২৯]

উপসংহার

সমাজে একে অপরের প্রশংসা করা একটি সাধারণ সৌজন্য। তবে এই প্রশংসা যখন অতিশয়োক্তিতে রূপ নেয়, তখন তা প্রশংসিত ব্যক্তির জন্য কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি বয়ে আনে। মহানবী (ﷺ) মানুষের সামনে অতিরিক্ত প্রশংসা বা চাটুকারিতার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। সামনাসামনি প্রশংসা, তোষামোদি বা চাটুকারিতা কেবল ব্যক্তির জন্য নয়, সমাজের জন্যও ক্ষতিকর। বিশেষ করে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের চারপাশে যারা সবসময় প্রশংসার ডালি নিয়ে বসে থাকে, তারা মূলত ওই ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

ইসলামের শিক্ষা হলো– আমরা যেন মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দেই, কিন্তু প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে মিথ্যার বা অহংকারের জালে আটকে না ফেলি। পরিমিত বোধ ও সত্যনিষ্ঠাই হোক আমাদের আচরণের মূল ভিত্তি।

---

[২১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২১৩৩১।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৫৭।*
[২৩] *সূরা আল-ক্বাসাস: ২৬।*
[২৪] *সূরা হূদ: ১১৩।*
[২৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২০৪।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩০০২।*
[২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৪৫।*
[২৮] *আল-আদাবুল মুফরাদ- হা. ৭৬১, সনদ সহীহ।*
[২৯] *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ- ২৬/১২৪।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধঃ

সলাতে টাখনুর সাথে টাখনু মিলানো

আমির হামজা বিন আব্দুল মালেক*

ভূমিকাঃ আমরা সলাত আদায় করি, কিন্তু ভেবে দেখেছি কি! কীভাবে দাঁড়াচ্ছি? কিভাবে রুকূ'-সিজদাহ্ করছি? সলাত শুধু দাঁড়ানো ও রুকূ', সিজদার সমষ্টি নয়, এটি শৃঙ্খলা, ঐক্য ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ মানার নাম।

প্রিয় পাঠক! রাসূল (ﷺ) সলাত শুরুর আগেই কাতার সোজা করতে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, কাতারের ফাঁক শয়তানের প্রবেশপথ। তাই সাহাবায়ে কেরাম কাঁধে কাঁধ, টাকনুর সাথে টাকনু মিলিয়ে দাঁড়াতেন। আর এটি ছিল সুন্নাহর জীবন্ত বাস্তবতা।

আজ সেই মহৎ সুন্নাহ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক মসজিদে। এমনকি সালাফি মানহাজের অনেক মসজিদে আমি দেখেছি কাতারে ফাঁক রয়ে যাচ্ছে, অথচ আমরা এটার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি না, আমরা দাঁড়াই ঠিকই, কিন্তু যেভাবে রাসূল (ﷺ) দাঁড়াতে শিখিয়েছেন, সেভাবে নয়। সেই জন্য জাতির কল্যাণে এই ছোট্ট প্রবন্ধটি।

এই প্রবন্ধ কোনো বিতর্ক নয়; এটি একটি আহ্বান। হারিয়ে যাওয়া সেই সুন্নাহকে আবার জীবিত করার আহ্বান। কাতার সোজা হলে শুধু দেহ নয়, অন্তরও এক কাতারে এসে দাঁড়ায়। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নেই।

● ইমামকে মুসল্লির দিকে মুখ করে বলতে হবে কাতার সোজা করুন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ﷺ) قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا، فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "নামাযের ইকামত দেয়া হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের দিকে মুখ করে বললেন: তোমরা কাতারগুলো সোজা করো, ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়াও। নিশ্চয়ই আমি আমার পেছন দিক থেকেও তোমাদের দেখি।" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "তখন আমাদের একজন তার সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং তার পায়ের (টাকনুর) সাথে টাকনু মিলিয়ে দিত।"[১]

একটু লক্ষ্য করুন উপরের হাদীসটি। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম কাতারে দাঁড়ানোর সময় টাকনুর সাথে টাকনু মিলিয়ে দাঁড়াতেন। আল্লাহর রাসূলের আদেশ পেয়ে যদি সাহাবা এবং তাবেঈনরা তা করতে পারেন তাহলে আমরা কেন করব না। এটি কাতারে টাকনুর সাথে টাকনু মিলানো ও কাতার সোজা করার সুন্নাহর বাস্তব প্রয়োগ।

● সহীহুল বুখারীতে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় আছে।

قال الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» بابُ إلزاقِ المَنْكِبِ بالمَنْكِبِ، والقَدَمِ بالقَدَمِ في الصَّفِّ، وقال النعمانُ بنُ بشيرٍ (ﷺ): رأيتُ الرجلَ مِنَّا يُلزِقُ كَعْبَهُ بكَعْبِ صاحِبِه.

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ-হ) তাঁর সহীহুল বুখারী গ্রন্থে বলেন: "কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়ানোর অধ্যায়।" আর নু'মান ইবনু বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– "আমি আমাদের মধ্যকার একজনকে দেখেছি, সে তার সাথীর টাকনুর সাথে নিজের টাকনু (গোড়ালি) লাগিয়ে দাঁড়াত।"

প্রিয় পাঠক! এটিও একটি খুব শক্তিশালী দলিল।

● **আপত্তিঃ** এটা তো সহীহুল বুখারীতে সনদ ছাড়া!

● **জবাবঃ** হ্যাঁ, ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ) এটি মুআল্লাকভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনু খুযাইমাহ্, ইবনু হিব্বান এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

● ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লা-হ) কী বলেন? তিনি বলেন:

وَأَمَّا إِلْزَاقُ الْكَعْبِ بِالْكَعْبِ فَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ فِيْ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ.

অর্থঃ "টাকনুর সাথে টাকনু লাগানো কাতার সোজা করার ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য।"[২]

● হাফিজ ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লা-হ), তিনি বলেন:

وَالْمُرَادُ بِذٰلِكَ الْمُبَالَغَةِ فِيْ الْمُحَاذَاةِ وَسَدِّ الْخَلَلِ.

অর্থঃ "এর দ্বারা (টাখনুর সাথে টাখনু মিলানো) উদ্দেশ্য হলো একই লাইনে থাকা ও ফাঁক বন্ধ করা।"[৩]

---

* *শিক্ষক: আস-সুন্নাহ আস-সালাফিয়্যাহ, কুষ্টিয়া।*

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৫, ৭২৬।*

[২] *শরহ সহীহ মুসলিম।*

[৩] *ফাতহুল বারী।*

সতর্কতা: তার মানে এটা না, যে সালাতের পুরো সময় চাপ দিয়ে টাকনু লাগাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে অন্যের খুশু খুজূ নষ্ট না হয়।

● ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ-র) বর্ণনা করেন,

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَسْتَوِيَ الصُّفُوْفُ، وَيُوَكِّلُ رِجَالًا يُقِيْمُوْنَ الصُّفُوْفَ، فَإِذَا أَخْبَرُوْهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ.

নাফে‘ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন: ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত তাকবীর দিতেন না। তিনি কিছু লোক নিযুক্ত করে রাখতেন, যারা কাতার সোজা করত। যখন তারা এসে তাকে জানাত যে কাতার সোজা হয়েছে, তখন তিনি তাকবীর দিতেন।[১]

আসারটি বিশ্লেষণ: ✔ কাতার সোজা করা খলিফা ও ইমামের দায়িত্ব, ✔ এটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, নামায শুরুই করা হতো না কাতার ঠিক না হলে, ✔ এখানে কোথাও জোর করে কষ্ট দেওয়ার কথা নেই; বরং সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করা।

এটা সুন্নাহর শক্তিশালী বাস্তব প্রয়োগ:

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ، وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَسُدُّوْا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ.

“তোমরা কাতারগুলো সোজা করো, কাঁধে কাঁধ মিলাও, ফাঁকগুলো বন্ধ করো, তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হও এবং শয়তানের জন্য ফাঁক রেখে দিও না।”[২]

শয়তানের জন্য ফাঁক ইমামদের ব্যাখ্যা:

● ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ-র), তিনি বলেন:

اَلْمُرَادُ بِالْفُرَجِ الْخَلَلُ فِي الصُّفُوْفِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْهَا فَيُفْسِدُ الصَّلَاةَ بِالْوَسْوَسَةِ وَذَهَابِ الْخُشُوْعِ.

অর্থ: এখানে ‘ফাঁক’ বলতে কাতারের ফাঁক বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো– শয়তান ওই ফাঁক দিয়ে ঢুকে নামাযে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে ও খুশু নষ্ট করে।[৩]

● হাফিজ ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ-র), তিনি বলেন:

سَدُّ الْفُرَجِ لِأَنَّهَا مَدْخَلٌ لِلشَّيْطَانِ، وَفِيْهِ التَّنْفِيْرُ وَالتَّشْوِيْشُ فِي الصَّلَاةِ.

অর্থ: ফাঁক বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তা শয়তানের প্রবেশ পথ এবং এতে নামাযে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।[৪]

● ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ-র), তিনি বলেন:

اَلْفُرَجُ تُوجِبُ اخْتِلَافَ الْقُلُوْبِ وَذَهَابَ الْأُلْفَةِ.

অর্থ: “কাতারে ফাঁক থাকলে অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক ভালোবাসা নষ্ট হয়।”[৫]

সাহাবাদের যুগে এই ‘আমল বাস্তবায়নের কিছু দৃষ্টান্ত:

● ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাতারে ফাঁক দেখলে নামায শুরু করতেন না:

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ، فَإِذَا أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ، وَإِذَا رَأَى فُرْجَةً فِي الصَّفِّ أَمَرَ بِسَدِّهَا.

নাফে‘ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, “‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাতার সোজা করার নির্দেশ দিতেন। যখন তাকে জানানো হতো যে কাতার ঠিক হয়েছে, তখন তিনি তাকবীর দিতেন। আর যদি তিনি কাতারে কোনো ফাঁক দেখতেন, তাহলে তা বন্ধ করার আদেশ দিতেন। প্রিয় পাঠক! এখানে “ফাঁক” বন্ধ করার বিষয়টি সরাসরি এসেছে, যা “শয়তানের ফাঁক” হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ। যা আপনারা উল্লেখিত হাদীসে দেখতে পেলেন।[৬]

● সাহাবীরা ফাঁক পেলে নিজেরাই তা ঠিক করতেন,

كَانُوْا يَتَعَاهَدُوْنَ الصُّفُوْفَ، فَإِذَا رَأَوْا فُرْجَةً سَدُّوْهَا.

সাহাবায়ে কেরাম কাতারগুলো লক্ষ্য রাখতেন, যখনই তারা কোনো ফাঁক দেখতেন, নিজেরাই তা বন্ধ করে দিতেন।[৭]

● ফাঁক রাখা = শয়তানের সুযোগ (তাবেঈদের ব্যাখ্যা),

إِنَّمَا تُسَدُّ الْفُرَجُ لِأَنَّهَا مَدَاخِلُ الشَّيْطَانِ.

‘ফাঁক বন্ধ করা হয়, কারণ এগুলো শয়তানের প্রবেশপথ।’

প্রিয় পাঠক! নিশ্চয়ই আপনি জানেন শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু সেহেতু শয়তান যদি থাকে আপনার পাশে সে কখনো চাইবে না শত্রুর ভালো হোক। সে আপনাকে ধোকা দিতে থাকবে।[৮]

---

[১] *মু‘আত্তা ইমাম মালিক- কিতাবুস সালাহ, باب تسوية الصفوف; মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ্- ১/৩৫১, সহীহ সনদে।*
[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৬৬৬।*
[৩] *শরহ সহীহ মুসলিম- ৪/১৫৯।*
[৪] *ফাতহুল বারী- ২/২১১।*
[৫] *তাফসীর আল-কুরতুবী।*
[৬] *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ্- ১/৩৫১; মুয়াত্তা ইমাম মালিক- কিতাবুস সালাহ, সনদ সহীহ।*
[৭] *মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক- ২/৫৬; মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ্।*
[৮] *ইবনু রজব হাম্বলি, ফাতহুল বারী (শরহ), হাফিজ ইবনু হাজার।*

আপত্তি: টাখনুর সাথে টাখনু না মিলালেও তো সলাত শুদ্ধ হবে।
জবাব: 'ইবাদতের শুদ্ধতা صِحَّة আর 'ইবাদতের পূর্ণতা كَمَال এক জিনিস নয় এই পার্থক্য না বুঝলে অনেক ভুল ধারণা তৈরি হয়।

● নামায সহীহ মানে কী?

সহীহ (صحيح) মানে ফর্‌যগুলো আদায় হয়েছে, নামায ভেঙে যায়নি, পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয়, কাতারে ফাঁক থাকলেও, রুকূ', সিজদাহ্, কিরাআত সব হয়েছে, অতএব নামায সহীহ।

● খিলাফে সুন্নাহ মানে কী?

খিলাফে সুন্নাহ মানে রাসূল (ﷺ) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সাহাবারা যেটার ওপর ছিলেন সেটা ছেড়ে দেওয়া, রাসূল (ﷺ) বলেন,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

কাতার সোজা করা নামায কায়েম করার অংশ।[১]

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, বলা হয়েছে– (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) অংশ মানে, নামাযের পরিপূর্ণতা ও শোভা। চলুন দেখি, বিজ্ঞ ইমামরা কিভাবে বুঝেছেন উক্ত হাদীসটি।

● ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ), তিনি বলেন:

فِيهِ أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَأَنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوْهٌ.

অর্থ: কাতার সোজা করা জোরালো সুন্নাহ, আর তা ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ।[২]

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, মাকরূহ বলা হয়েছে, নামায বাতিল বলা হয়নি।

● হাফিজ ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ), তিনি বলেন,

اَلْمُرَادُ إِقَامَةُ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ لَا أَصْلِهَا.

অর্থ: "এখানে উদ্দেশ্য নামাযের রূপ ও সৌন্দর্য কায়েম করা, নামাযের মূল অস্তিত্ব বাতিল করা নয়।"[৩]

টাকনুর সাথে টাকনু মিলানোর উপকারিতা:

● কাতার সোজা হয় টাকনু মিলালে সবাই একই লাইনে দাঁড়ায়, কাতার বাঁকা বা ভাঙা থাকে না।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ.

'তোমরা কাতার সোজা করো।'

● কাতারের ফাঁক বন্ধ হয়: টাকনু মিলানো ফাঁক বন্ধ করার কার্যকর মাধ্যম। ফাঁক থাকলে শয়তান ঢোকে ওয়াসওয়াসা বাড়ায়।

وَسُدُّوْا الْخَلَلَ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ.[৪]

● সাহাবাদের বাস্তব 'আমল অনুসরণ হয়। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমাদের একজন তার সাথীর কাঁধে কাঁধ এবং টাকনুর সাথে টাকনু মিলাত।[৫]

এটি কেবল কথা নয়, বাস্তব প্রয়োগ।

● ঐক্য ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সবার শরীর এক লাইনে হলে অন্তরের দূরত্ব কমে জামা'আতের ঐক্য দৃশ্যমান হয়। ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: কাতারে ফাঁক থাকলে অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হয়।

● খুশু রক্ষা পায় (যদি জোর না করা হয়): নামাযের শুরুতে টাকনু মিলিয়ে কাতার ঠিক করলে, পরে ধাক্কাধাক্কির দরকার হয় না, মনোযোগ ভাঙে না, জোর করে চাপ দেওয়া সুন্নাহ নয় এতে খুশু নষ্ট হয়।

● ইমামের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে: ইমাম কাতার সোজা করতে বলেন, মুক্তাদী টাকনু মিলালে ইমামের নির্দেশ সহজে বাস্তবায়ন হয়। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাতার ঠিক না হলে তাকবীর দিতেন না।

● সুন্নাহর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়: টাকনু মিলানো নিজে উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো– ✔ কাতার সোজা, ✔ ফাঁক বন্ধ, ✔ শয়তানের পথ রোধ।

শেষ কথা: প্রিয় পাঠক! টাকনুর সাথে টাকনু মিলিয়ে কাতার সোজা করা কোনো অতিরিক্ত কাজ নয়; এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সচেতনভাবে শেখানো এক মহৎ সুন্নাহ। এর উদ্দেশ্য কাউকে কষ্ট দেওয়া নয়; বরং কাতারের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ফাঁক বন্ধ করা এবং শয়তানের প্রবেশপথ রুদ্ধ করা। সাহাবায়ে কেরাম এই সুন্নাহকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাদের নামায ছিল ঐক্য ও খুশুর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

আজ আমাদের দায়িত্ব এই সুন্নাহকে নিয়ে বিরোধ নয়; বরং প্রজ্ঞা ও নম্রতার সাথে তা জীবিত করা। নামায শুরুর আগেই কাতার ঠিক করা, একে অপরের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং সুন্নাহর উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা এটাই রাসূল (ﷺ)-এর শিক্ষার সঠিক প্রতিফলন।

যদি আমরা আবার সচেতনভাবে কাতার সোজা করি, টাকনু মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করি, তবে শুধু কাতারই নয়। আমাদের অন্তরও সোজা হবে। আর সেখান থেকেই শুরু হবে নামাযের প্রকৃত সৌন্দর্য ও উম্মাহর ঐক্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুক –আমীন।

---

[১] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[২] *শরহ সহীহ মুসলিম।*
[৩] *ফাতহুল বারী।*
[৪] *সহীহ মুসলিম।*
[৫] *সহীহুল বুখারী।*

জান্নাতে একটি ঘর

হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী*

ঘর! শব্দটা শুনলেই আমাদের মনে অপকটে ভেষে উঠে, চার দেওয়ালে ঘেরা একটি কুটির মাত্র। যার বিনির্মাণের পেছনে রয়েছে শত তিক্ত বেদনাদয়ক অধ্যায়। পরবর্তীতে যা হয় তার জন্য এক রাজপ্রাসাদ। ক্লান্তি শেষে প্রশান্তিকর স্থান। যেখানে আসলে ঘুচে যায় শত ব্যাথা, শত বেদনা। তারপরেও সেই কষ্টার্জিত ঘরটিতে কোনো না কোনো সময় ভাঙন লাগে, বদলে যায়, কিংবা মানুষের হাতছানি ছাড়াই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। দুনিয়ার কোনো ঘরেরই স্থায়িত্ব নেই; দেয়ালের রঙ মুছে যায়, ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ে, আর মানুষের স্মৃতি ধুলো হয়ে মাটিতে মিশে যায়। তবুও মানুষ ঘর চায় কারণ ঘর মানে নিরাপত্তা, শান্তি, বিশ্রাম ও ভালোবাসার আশ্রয়।

কিন্তু মানুষের অন্তরে যে চূড়ান্ত শূন্যতা থেকে যায়, তা কি এই পৃথিবীর কোনো ঘর সত্যিই পূর্ণ করতে পারে? না, পারে না।

আর ঠিক সে সময়ই যখন কানে ভেসে আসে, "জান্নাতে ঘর!" যা শুনলেই হাজারো খুশির চিন্তা মনে উঁকি দিয়ে উঠে। যার মধ্যে আনন্দ, খুশি প্রশান্তির অন্ত নেই। এমন স্থান যা তুচ্ছ দুনিয়ার হাজারো ব্যাথাকে নিমিশেয় ভুলিয়ে দিবে। কতইনা ভালো লাগে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে বাক্যটা শুনলেই! যেই ঘরে থাকবে না কোনো ফাটলের চিহ্ন, না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের বাড়তি ঝামেলা, দেয়ালের রং মুছবে না, ছাদের প্লাস্টার খসবে না। যা দুনিয়ার ঘরের মতো অস্থায়ী হবে না। যেখানে প্রশান্তি এমনভাবে বাসা বাঁধবে যেন কোনোদিন ক্লান্তি তার দুয়ার খুঁজে পাবে না।

আমরা কে না পেতে চাই, সেই অনাবিল শান্তির ঘরটি। কিন্তু আমরা কতজন সেই সম্মানিত ঘরটি পওয়ার জন্য কাজ করি। আমরা কি মনে করে নিয়েছি যে, শুধু কল্পনার জগতে ঘরটি পাওয়ার চিন্তা করলেই তা পাওয়া যাবে? যেখানে আপনাকে আপনার বাবাকে দুনিয়ার একটি সাধারণ ঘর বানাতেই কত কষ্ট, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাঠ পারি দিতে হয়েছে। তাহলে বিনা শ্রমে জান্নাতে সেই মহান ঘর পাওয়ার অলিক কল্পনার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছেন নাতো?

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে কষ্ট-কঠিন কাজ দিয়ে, আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে নফসের কামনা-বাসনা ও লালসা দিয়ে।"

আমরা নাফসের কামনা বাসনায় পরে, আমাদের সকালটাই করি মহান আল্লাহর অবধ্যতা দিয়ে, আর দিনের শেষভাগটাও কোনো না কোনো নাফারমানির মাধ্য দিয়ে কাটাই। তাহলে আমরা কেমনে জান্নাতের একটি ঘর পাওয়ার আশা করতে পারি। দুনিয়ার একটি ঠুনকো ঘর তৈরিতে যেমন শ্রম দিতে হয় তাহলে অবশ্যই জান্নাতে একটি ঘর পাওয়ার জন্য আমাদরেকে কিছু কাজ করতেই হবে।

আমাদের প্রিয়নবী (ﷺ) আমাদের জন্য কিছু সহজ কাজের কথা বলে দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা সেই কল্পনাতীত জান্নাত পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করব। নিম্নে সেই গুরত্বপূর্ণ কাজগুলোই দেওয়া হলো।

১. সূরা আল-ইখলা-স দশবার পাঠ:

عن مُعاذِ بنِ أنَسٍ (رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله (ﷺ) مَن قرأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عشرَ مرّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

মু'আয ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আল-ইখলা-স দশবার পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।"[১]

সূরা আল-ইখলা-স-এ মহান আল্লাহর একত্বের পূর্ণ বিবরণ আছে। এ সূরার প্রতি ভালোবাসা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। মাত্র দশবার পাঠেই জান্নাতে ঘর, মহান আল্লাহর অসীম দয়ার নিদর্শন।

২. সালাতের সারির ফাঁক পূরণ:

عن عائشةَ (رضي الله عنها) قالت: قال رسوْلُ الله (ﷺ): مَن سدَّ فَرْجَةً رفعه اللهُ بها درجة، وبنى له بيتًا في الجنة.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি সালাতের সারির ফাঁক পূরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।"[২]

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। ফাঁক পূরণ করলে শয়তানের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়। এটি শুধু সুন্নাহ নয় জান্নাতের ঘর নির্ণামেরও মাধ্যম বলতে পারেন।

---

* *আল-জামি'আহ্ আস-সালাফিয়্যা, রাজশাহী।*

[১] *সহীহুল জামে'- হা. ৬৪৭৩।*

[২] *সহীহ আত-তারগীব- হা. ১০০, মা. শা., হা. ৫০৫/৫।*

৩. মসজিদ নির্মাণ:

عن عثمانَ بنِ عفانَ (ﷺ) قال: قال رَسُوْلُ الله (ﷺ): «مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।"[১]

উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, হাদীসে মসজিদ নির্মাণের সাথে একটি শর্তযুক্ত করে দিয়েছে তা হলো মসজিদ নির্মাণটা যেন একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান যুগে দেখা যা ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল লেগে টাকার মহাড়া দেখিয়ে দু'জন দু'টা মসজিদ তৈরি করে ফেলছে। একই গ্রামে দুই থেকে তিনটা করে মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে যার পিছনের ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তার অধিকাংশই টাকার মহাড়া ও গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। হায় আফসোস! আসলে এদের জন্য জান্নাতের সেই ঘরগুলো নয়।

৪. দিনে-রাতে ১২ রাকআত সুন্নাত:

عن أمِّ حبيبةَ (رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ الله (ﷺ): مَن صلّى في يومٍ وليلةٍ ثِنتي عشرةَ ركعة، بُني له بيتٌ في الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».

উম্মে হাবীবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাকআত সালাত পড়ে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়: যোহরের আগে চার রাকআত, যোহরের পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, 'ইশার পরে দুই এবং ফজরের আগে দুই রাকআত।"[২]

৫. সালাতুদ্ দুহা ও যোহরের আগে চার রাকআত:

عن أنسٍ (رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله (ﷺ): مَن صلّى الضحى أربعًا، وقبل الأولى أربعًا، بُني له بيتٌ في الجنة.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি সালাতুদ্ দুহা চার রাকআত এবং যোহরের আগে চার রাকআত সালাত পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।"[৩]

সালাতুদ্ দুহা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়ার 'ইবাদত। এর সঙ্গে যোহরের আগের নফল যুক্ত করলে জান্নাতের ঘর নিশ্চিত।

৬. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য:

عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟... ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الحَمْدِ.

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যখন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ ফেরেশ্তাদের বলেন: 'তোমরা কি তার হৃদয়ের ফল নিয়ে নিয়েছ?' 'আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং এর নাম দাও বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর)'।"[৪]

সন্তানের মৃত্যু মানুষের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার একটি। ধৈর্য ও "ইন্না লিল্লাহ" বলার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে বিশেষ ঘর দান করেন।

৭. রোগীকে দেখতে যাওয়া:

عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): "مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا".

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায়, আসমান থেকে একজন ঘোষক বলে– 'তুমি কল্যাণ লাভ করলে, তোমার পদচারণা কল্যাণময় হলো এবং তুমি জান্নাতে একটি ঘর লাভ করলে'।"[৫]

রোগী দেখতে যাওয়া একদিকে মানবিক দায়িত্ব, অন্যদিকে জান্নাতের ঘর লাভের উপায়।

৮. বাজারে দু'আ পাঠ করা:

عَنْ عُمَرَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ): "مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ، فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ... كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ،... وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".

[পরবর্তী অংশ ২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫৩৩; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ১২৯১।*
[২] *আত্ তিরমিযী- হা. ৪১৫; আন্-নাসায়ী- হা. ১৭৯৪, সহীহ।*
[৩] *সহীহুল জামে'- হা. ১৩৪০।*
[৪] *আত-তারগীব- হা. ৭৫৯; আত্ তিরমিযী- হা. ১০২১, হাসান।*
[৫] *আত্ তিরমিযী- হা. ২০০৮; ইবনু মাজাহ্- ১৪৪৩, হাসান।*

উম্মাহর জাগরণ: ধর্মের অনুসরণ

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

“মুসলিম উম্মাহ” ইতিহাসে কালে কালে দীর্ঘ পথ চলার এক নাম। এই উম্মাহ (জাতি) গড়েছে সুষ্ঠ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র এবং দূর করেছে সহিংসতা ও পাপাচার-অন্যায়। আজ এই উম্মাহ আবার নিজেদের এসব অবক্ষয় ও বিভাজনের জালে বন্দি করে ফেলছে। যে জাতি জাহিলী অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করতে পারে; সেই জাতি আবার সংস্কার করা অন্ধকারে কীভাবে পতিত হতে পারে? এই প্রশ্নটা যেন মস্তিষ্ক থেকে নয়; বরং অন্তর থেকে ওঠে আসে। ঠিক এটাই ঘটেছে ও ঘটতেছে। জাতির এই অবক্ষয়ের মধ্যে তাদের শিক্ষা, ধর্মীয় নীতি, সমাজ নীতি ও সঠিক নেতৃত্ব থেকে দূরে সরানো হচ্ছে। এসব দূরাবস্থা থেকে ফিরে আসার জন্য যে দু’টি মাধ্যম রয়েছে, তা হলো– কুরআন ও সুন্নাহ। এই দু’টি মাধ্যমে উম্মাহর জাগরণ সম্ভব। ইসলাম ধর্মের অনুসরণ ও জাগরণ শিরোনামের ভিত্তিতে একই সূত্রে গাঁথা।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানি তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন যে ইসলামের আদর্শ বহু বিশ্লেষণে স্পষ্ট করে দেয়, উম্মাহ অর্থই হলো– “এমন সমাজ যার আইন, মর্ম ও ভাবনা ইসলামী ভিত্তিতে গঠিত এবং যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই সমগ্র সম্পর্ক ও নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি”। উম্মাহর জাগরণ বলতে বোঝানো হচ্ছে– সচেতন হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কুরআন ও সহীহ হাদীসে বারবার এ বার্তা এসেছে যে, মুসলিমরা তাদের চেতনা, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে।

ধর্ম যদি শুধু আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে, তা সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। জাগরণ ও ধর্মের অনুসরণ একসাথে পরিচালিত হলে সমাজে সমতা, ন্যায়, মানবিক মর্যাদা এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহ এত বেশি দল ও মতে বিভক্ত যে তাদেরকে এই মুহূর্তে এক করা অসম্ভব। এটা সম্ভব নয়, এটা গোটা পৃথিবী নিয়ে এককভাবে চিন্তা হবে না। কেননা, এটা রাসূল (ﷺ)-এর ভাষ্যের উল্টা হয়ে যায়। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَامَ فِينَا فَقَالَ "أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ". زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو فِي حَدِيْثَيْهِمَا" وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ". وَقَالَ عَمْرٌو "الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ".

অর্থাৎ- মু‘আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি জান্নাতে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা‘আত। ইবনু ইয়াহ্ইয়া ও ‘আম্র (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “বিষয়টি হলো, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন দলের আবির্ভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে (বিদ’আতের) প্রবৃত্তি এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়।[১]

শায়খ নাসিরউদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার আত-তারগিব গ্রন্থে “জামা‘আত”-এর সম্পর্কে বলেন: অর্থাৎ- “সাহাবীদের জামা‘আত- যেমনটি কতিপয় বর্ণনায় পাওয়া যায়। অপর বর্ণনায় সে দলটির পরিচয় বলা হয়েছে আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি

---

* *মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখি, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

[১] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৫৯৭; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৬৯৩৭; আল- জামিউস সগীর- হা. ২৬৪১; সহীহ আত-তারগীব- হা. ৫১; সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ২০৪।*

তার অনুসরণকারীগণ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত”। আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি, মুসলিম উম্মাহ বহু দলে বিভক্ত হবে। শুধুমাত্র রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-দের পথে অটল থাকা মানুষরাই কেবল হক্ব তথা সঠিক পথে থাকবে। তারাই মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলতে পারবে। তাদের দ্বারা গড়ে ওঠবে আগামীর ভবিষ্যৎ।

উম্মাহর জাগরণের মূল শক্তি: আজকের বিশ্বে মুসলিমরা বিভাজন, রাজনৈতিক দিকপাল এবং সামাজিক অসঙ্গতির কারণে বিপুল চ্যালেঞ্জের মুখে। এই প্রেক্ষাপটে উম্মাহর ঐক্য ও জাগরণ শুধু অতীতের ইতিহাস নয়, বর্তমান সময়েরও অপরিহার্য প্রয়োজন।

“উম্মাহ” শব্দের অর্থ হলো– একটি ঈমানভিত্তিক সম্প্রদায়, যা কেবল ধর্মীয় আচার-অনুশীল (‘ইবাদত) নয়; বরং নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সংহত শক্তি। ইসলামের ইতিহাসে উম্মাহকে সবসময় ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজ হিসেবে দেখা হয়।

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মাহ মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় মুসলিমরা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারের মধ্যে নবী (ﷺ) “মু’আখাহ” বা ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ শুধুমাত্র আত্মিকভাবে নয়, বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সংহত হয়। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا﴾

“আর তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হবে না।”[১]

এখানে ‘রশি’ দ্বারা বোঝানো হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহ যেন বিভক্ত না হয়। ঐক্যহীনতা শুধু ধর্মীয় ক্ষতি নয়; বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তিকেও দুর্বল করে। ‘আমলগুলো বরবাদ করে। যেমন- অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের ‘আমলগুলোকে নষ্ট করে দিও না।”[২]

বক্ষমান আয়তটি থেকে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই উম্মাহর জাগরণের মূলশক্তি নিহিত।

মুসলিম উম্মাহর আবস্থা ও জাগরণ: মুসলিম জাতির আবস্থা বুঝে মূলত আমাদের ব্যাবস্থা নিতে হবে। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ যেন এমন এক সমুদ্রের মাঝে যেখানে তাদের কোনো নাবিক নেই। নাবিকহীন জাহাজ সমুদ্রে সঠিকভাবে চলা সম্ভবপর নয়। এ যুগে পৃথিবীতে চারদিকে সেকুলারিজমের জয় জয়কার চলছে। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ, পূজিবাদ ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদির মতো মতবাদ যেগুলো মুসলিম জাতিকে শোষণ করে রেখেছে। বিশেষ করে বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে এই মতবাদগুলো নিয়ে নিজেদের চেতনা সঞ্চারিত করে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। চিন্তা করলে দেখা যায়, কতটা জঘন্য হলে মানুষ এসব কাজ করতে পারে। চিন্তা করে না বাস্তবিক অর্থে তারা ইসলামকে শুধু মুখে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ শৈথিল্যবাদের দিক পাওয়া যায়। মূলতঃ তারা ইসলামের মৌলিক নীতিমালা থেকে বিচ্যুত। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে (জীবনব্যবস্থা) গ্রহণ করতে চাইবে তা কখনও কবুল করা হবে না; বরং সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”[৩]

তাই উম্মাহর নিকটে আহ্বান-নিজেদের বিশ্বাস, নিজেদের ধর্মের সাথে ভিন্ন কোনো স্বজাতীয় কিংবা বিজাতীয় মতবাদের সাথে আমাদের আপস চলবে না। শেষ পর্যন্ত এই সুমহান ধর্মের অনুসরণ ছাড়া আমাদের নিকট অন্য পথ আর খোলা থাকবে না। এজন্য সমগ্র মুসলিম উম্মাহর একান্ত প্রয়োজন এই পথ আঁকড়ে ধরে সম্মুখ অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

[১] *সূরা আ-লি-‘ইমরান: ১০৩।*
[২] *সূরা মুহাম্মদ: ৩৩।*
[৩] *সূরা আ-লি-‘ইমরান: ৮৫।*

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহর ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যবরণ করো না।"[১]

বর্তমান যুগে মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্মের গোঁড়ামি। প্রথমে আলোচনা হয়েছে ধর্মে থেকেও ধর্মের বিরোধিতা। এটি মূলতঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের কারণে। দ্বিতীয়টি ধর্মের গোঁড়ামি। মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার যেগুলো প্রায়শ সম্পূর্ণ মিথ্যাভিত্তির ওপর থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পীর পূজা ও মাযার পূজা, ওলি, আউলিয়া, গাউস, কুতুব, ফকির প্রভৃতি উপাস্য বা বিপদ থেকে রক্ষাকারী মনে করা। যেগুলো সঠিক 'আক্বীদাহ্কে হরণ করার মাধ্যমে ভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর তুমি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো উপকার করতে পারে না বা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যদি তুমি এরূপ করো তাহলে তুমি যালেমদের আন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

মহান আল্লাহকে আহ্বানের পথ থেকে যেমনি মুসলিম সমাজের মানুষরা সরে গিয়েছে তেমনি তাকে এক গ্রহণযোগ্য উপাস্য মানা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। এসব শির্কী পাপাচার থেকে যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ বেড়িয়ে আসতে পারবে না ততদিন পর্যন্ত তারা নিজেদের জাগিয়ে তুলতে পারবে না এবং তারা সঠিক হেদায়েতের পথও খুঁজে পেতে সক্ষম হবে না। ধর্মের নামে এসব ধর্মহীন মতবাদ মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করছে ও পাশাপাশি ঐক্যহীনতার এক মরণব্যাধি মুসলিম সমাজে বাধাহীনভাবে আঁচড়ে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে বলেছেন–

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ﴾

"আর তোমরা তাদের মতো হইও না যারা (ঈমান ও দিক নির্দেশনার পরও) বিভক্ত হয়েছে এবং মতভেদ করেছে।"[৩]

এই আয়াত মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দেয় যে অনৈক্য ও মতভেদ উম্মাহকে দুর্বল করে দেয়; এটা শুধু ভাবনাগত বিভাজন নয়, বরঞ্চ সামগ্রিক শক্তি, নৈতিকতা ও ঐক্যগত সম্পর্ক ক্ষয় করে। সমসাময়িক বিশ্বের মুসলিম সমাজেও দেখা যায় যে রাজনৈতিক, মতবাদ ও সাংস্কৃতিক বিভাজন মুসলিমদের ভাগ করে দিয়েছে এবং তাদের ঐক্যকে দুর্বল করেছে। এই পরিস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহর ঐক্যবোধ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক সমস্যার মাত্রা ও সময় পরিবর্তিত হলেও মূল ঈমানভিত্তিক ঐক্যের নির্দেশ আজও অটল। তাই সবকিছু ও সকল সম্যসা পরিবর্তনের মূলমন্ত্র ও জাগরণ হচ্ছে– ধর্মের অনুসরণ। আর সকল প্রকার ধর্মের বিরোধিতা ও ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্তি লাভ করা। উম্মাহর জাগরণ কেবল কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না এটি বাস্তব জীবনে ধর্ম ও সেটার অনুসরণের মিলন। আমরা শুধু উম্মাহর জাগরণ বলতে ঐক্য বা শাসন কায়েমকে মনে করি থাকি; কিন্তু আমরা দেখি না যে আমরা নিজরা ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছি।

পরিশেষে বলা যায়, উম্মাহর জাগরণ কোনো বাহ্যিক স্লোগান বা আবেগী আন্দোলনের নাম নয়; বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি সচেতন, আন্তরিক ও পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যে ফিরে আসার এক গভীর আত্মিক বিপ্লব। ধর্মের অনুসরণ যেন শুধু আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না থেকে 'আক্বীদাহ্, 'ইবাদত, নৈতিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও জীবনব্যবস্থার সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়– তবেই সত্যিকার অর্থে উম্মাহর জাগরণ সম্ভব। ইতিহাসে থেকে দেখা যায়, উম্মাহ যখন ওয়াহীর পথ আঁকড়ে ধরেছে, তখন দারিদ্র্য, ভীতি ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মান ও নেতৃত্ব দান করেছেন; আর যখন ধর্মকে খণ্ডিত করে নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসারী হয়েছে, তখনই পতন নেমে এসেছে। সুতরাং আজকের জাগরণ মানে হলো– বিদ'আত ও বিভ্রান্তি পরিহার করে বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন, মতভেদে বিভক্ত না হয়ে আদব ও ইনসাফের সাথে ঐক্য রক্ষা এবং ইল্ম-'আমলে-দা'ওয়াতের ভারসাম্যে জীবন গড়া। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "উম্মাহর সকল ফিতনার মূল কারণ হলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া।"[৪]

[১] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১০২।*
[২] *সূরা ইউনুস: ১০৬।*
[৩] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১০৫।*
[৪] *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।*

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন:

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ

[অষ্টম পর্ব]

(ঙ) ইতিহাস বিষয়ক রচনা:

১. আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম: এটি ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ।[১] দশ খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি আয়া সুফিয়া, ইস্তাম্বুল এর গ্রন্থাগার, প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগার, বৃটিশ মিউজিয়াম, লণ্ডন, হাবীব যায়্যাত খাযাইনুল কুতুব ফী দামিশক প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে[২] তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসের গুরুত্ব, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের অনুসৃত নীতি, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াবলী আলোচনা করেছেন।[৩] অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী আরব ও অনারব বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলী আলোচনা করেছেন।[৪] এ গ্রন্থের একটি বড় অংশ জুড়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এতদ্ব্যতিত এতে খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ, হুসাইনের শাহাদাত, যায়দ ইবনু 'আলী ও খারিজীদের আন্দোলন এবং 'উমাইয়্যাহ্ ও 'আব্বাসী শাসনামলের ৬৭৪ হিজরি পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে।[৫] প্রতি বছর বাগদাদে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে গ্রন্থকার এতে সেসব ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং উল্লিখিত বছরসমূহে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও আলোচনা করেছেন।[৬] অতএব গ্রন্থটি জীবনী ও ঘটনাবলী আলোচনার এক সমগ্রিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।[৭] এটি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ইস্তম্বুল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুসরণে ১৩৫৫-৫৯ হিজরিতে দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ কর্তৃক দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৮] ১৪১২ হিজরিতে (১৯৯২ খ্রি.) দারুল কুতুব আল 'ইলামিয়্যাহ, বৈরূত কর্তৃক মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির 'আত্বা ও মুসতাফা 'আব্দুল কাদির 'আত্বা-এর সম্পাদনায় নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৯] ড. সুহাইল যাকার-এর সম্পাদনায় এটি দারুল ফিকর, বৈরূত, থেকে ১৪১৫ হিজরি মুতাবিক ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণের কপি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিতে (Accs No. 1604) সংরক্ষিত আছে।

২. তালকীহু ফাহূমি আহলিল 'আসর ফি 'উয়ূনিত-তারীখ: এ গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি মরক্কোর 'আব্দুল হাই আল কাত্তানী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এটি ব্রুকলম্যানের সম্পাদনায় লাইডেন, ব্রাসেলস থেকে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে, দিল্লী থেকে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং মুহাম্মাদ ইউসুফ বেরলভীর সম্পাদনায় পুনরায় দিল্লী থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশত হয়।[১০]

(চ) ভৌগলিক ইতিহাস:

ক. মানাকিবু বাগদাদ: এটি মাতবা'আতু দারিস সালাম বগদাদ থেকে ১৩৪২ হিজরিতে প্রকাশিত হয়। এর পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ ও ইরাক মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[১১]

(ছ) জীবনী-চরিত বিষয়ক গ্রন্থাবলী:

১. সিফাতুস সাফওয়াহ: গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে আবূ'আয়ম আল-ইসফাহানীর রচিত হিলইয়াতুল আওলিয়া এর সারসংক্ষেপ।[১২] এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনী এবং

---

[১] *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮; *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫০-১৮৫১।

[২] *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।

[৩] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৩১।

[৪] *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহয়াহ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

[৫] *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০; *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৩২।

[৬] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

[৭] *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০; *ইবনুল জাওযী* , পৃ. ১৪৮।

[৮] *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০ ; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৮৩।

[৯] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৪৮।

[১০] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ, পৃ. ৩২৪; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ৮৬-৮৭।

[১১] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

[১২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

প্রসিদ্ধ সাহাবী, তাবি'ঈ[১] ও পরবর্তীকালেরর সূফীদের জীবনী ও উক্তিসমূহ স্তরানুসারে আলোচনা করা হয়েছে।[২] এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কপি বার্লিন গ্রন্থাগার, দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, প্যারিস জাতীয় গ্রন্থগার, লাইডেন একাডেমী লাইব্রেরি প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৩] ১৩৫৫-১৩৫৬ হিজরিতে এটি দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ থেকে চার খণ্ডে[৪] এবং ১৯৮৯/১৪০৯ হিজরিতে দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরূতসহ বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

২. কিতাবুল আযকিয়া: হাজী খলীফা ও ইসমা'ঈল আল-বাগদাদী এ গ্রন্থের নাম কিতাবুল আযকিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] ব্রুকলম্যান এ গ্রন্থের নাম কিতাবুন ফী আখবারিল আযকিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] আয-যাহাবী গ্রন্থটির নাম আল আযকিয়া এবং যিরিকলী আল আযকিয়া ওয়া আখাবারুহুম উল্লেখ করেছেন।[৮] গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপি বার্লিন গ্রন্থাগার, আয়া সুফিয়া (ইস্তাম্বুল)-এর গ্রন্থাগার, জামি'উল ফাতিহ গ্রন্থাগার, আল-মাকতাবাতুল আসফিয়্যাহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৯] ইবনুল জাওযী এ গ্রন্থের প্রথমে মানুষের মেধার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। অতঃপর তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরের মেধাবী ব্যক্তিদের মেধা সম্পর্কিত ছোট ছোট কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[১০] এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থটি কায়রোর আল-মাতবা'আতুল মায়মায়্যিাহ ১৩০৬ হিজরিতে এবং 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আস-সিদ্দীক আল গামারীর সম্পাদনায় কায়রোর দারুত তাবা'আতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত।[১১]

৩. মাওলুদুন নবী (ﷺ): গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বার্লিন গ্রন্থাগার, দারুল কুতুব আল খাদীবিয়্যাহ ও দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এটি কায়রো থেকে ১৩০০ হি., ১৩০১ হি. ও ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং বৈরূত থেকে ১৩২০ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে।[১২]

৪. যামুল হাওয়া: আয-যাহাবী ও ইসমা'ঈল আল-বাগদাদী বলেছেন, গ্রন্থটি এক খণ্ডে সমাপ্ত।[১৩] গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বার্লিন গ্রন্থাগার, বাশীল আগা (ইস্তাম্বুল), প্যারিস জতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[১৪] গ্রন্থকার এ গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে শরী'আত গর্হিত প্রেম-ভালোবাসার কারণে যে সমস্ত বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোসহ প্রবৃত্তির ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এর থেকে বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি, আত্মসংযম, আত্মার পরিশুদ্ধি, সংযত দৃষ্টি, ইযযত-আবরু সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন।[১৫] গ্রন্থটি মুতাফা 'আব্দুল ওয়াহিদ-এর সম্পদনায় কায়রোর মাতাবা'আতুস সা'আদাহ প্রেস থেকে ১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৬]

৫. কিতাবুল হুমকা ওয়াল মুগাফলিলীন: হাজী খলীফা, আয যিরিকালী ও ব্রুকলম্যান এ শিরোনামে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন।[১৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা এবং তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে আল-মুগাফফিলীন শিরোনামে এক খণ্ডে সমাপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে শহীদ 'আলী পাশার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[১৯] এছাড়াও ইস্তাম্বুলের আল মাকতাবাতুল হামীদিয়্যাহ ও আয়া সুফিয়া গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[২০] এতে গ্রন্থকার আহমাক ও অলসদের কাহিনী বর্ণনা

---

[১] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৪৮।
[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮।
[৩] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১১৬।
[৪] প্রাগুক্ত; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
[৫] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৪৮।
[৬] *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮৮; *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২০-৫২৩; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ২৯ ও ৪২।
[৭] ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাব আল-আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬১-৬৬২; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ৩৬।
[৮] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৩৯; আয যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯-৯০।
[৯] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
[১০] *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০-৪৭১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
[১১] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৩৯।
[১২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৫; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৯২।
[১৩] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬; *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২১।
[১৪] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১০১।
[১৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; *ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৪৯-১৫০।
[১৬] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১০১।
[১৭] *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১৩; *আল-আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাব আল-আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬১-৬৬২; মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী, পৃ. ১০১।
[১৮] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬।
[১৯] *ইসলামী বিশ্বাকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
[২০] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৩৬।

করেছেন।[১] এটি ১৩৪৫ হিজরিতে দামিশক থেকে ও ১৩৫৭ হিজরিতে এবং মিসর থেকে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে 'উসমান খলীলের পরিমার্জন ও টিকাটিপ্পনিসহ প্রকাশিত হয়।[২]

৬. মানাকিবু আহমাদ ইবন হাম্বল: মুহাম্মাদ আমীন আল-খানজী মিসর থেকে ১৩৪৯ হিজরিতে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এর পাণ্ডুলিপি আল-মাকতাবাতুয যাহিরিয়্যাহ দামিশক এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[৩] এতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মানাকিব বর্ণিত হয়েছে।

৭. মানাকিবু হাসান আল-বাসরী: এটি ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।[৪] এতে হাসান আল-বাসরীর মানাকিব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(জ) গল্প ও কাহিনী:

১. আল কুস্সাস ওয়াল মুযাক্কিরীন: ব্রুকলম্যান এ শিরোনামে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন।[৫] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বালী কিতাবুল কুসসাস ওয়াল মুযাক্কিরীন শিরোনামে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন।[৬] গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি লাইডেন একাডেমী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৭] এতে ইবনুল জাওযী মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পকার এবং তাদের হাস্যকর কাল্পনিক গল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সে সময়কার ভিত্তিহীন ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যার অধিকাংশ আজ পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে।[৮] এটি বৈরূতের দারুল কুতুব আল-ইলাময়্যাহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৯]

(ঝ) আল ওয়া'য ও চরিত্র গঠন:

১. তালবীসু ইবলীস: এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত একটি উপদেশ ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে মানুষের চিন্তা-চেতনায় ও কাজে-কর্মে শয়তানের অনুপ্রবেশের পথগুলো চিহ্নিত করে মানুষ কিভাবে শয়তানের ফাঁদে পড়ে তা বর্ণনা করেন এবং জনসাধারণকে অনুরূপ শয়তানী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি এতে দার্শনিক, নবুওয়্যাত অস্বীকারকারী, খারিজী, আধ্যাত্মবাদী, আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, কবি, সাহিত্যিক, শাসক, বিভিন্ন স্তরের সূফী ও সাধারণ মানুষের ভুল-ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরেন এবং তাদের তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়াও তিনি উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন ইসলামী দলের চিন্তাধারা ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।[১০] এ গ্রন্থে তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে কঠোরতার আশ্রয় নিলেও তা ছিল অত্যন্ত সঠিক ও যৌক্তিক। নিম্নে তাঁর সমালোচনার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

ইবনুল জাওযী এ গ্রন্থে তাঁর যুগের ফকীহদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁরা শুধু তাহারাত, নাজাসাত প্রভৃতি ছোটখাটো মাসআলা, ইখতিলাফ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়েই সর্বদা চিন্তা ভাবনা করেন। ইসলামের বিধি-বিধান পালনের প্রতি আগ্রহ ও অন্তরে কোমালাত সৃষ্টি এবং পরকালের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য কুরআন, হাদীস, সীরাতে রাসূল (ﷺ) ও সীরাতে সাহাবা তাঁরা আলোচনা করেন না। একজন ফকীহর ফিক্হী মাসআলার সাথে এসব বিষয়গুলোও আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।[১১]

ওয়া'ইযীনের (ধর্মোপদেশদানকারী) সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, তাঁরা ইসলামের বিধানাবলী ও গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়সমূহ আলোচনার পরিবর্তে আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর ভাষায় আলোচনা করেই সময় কাটিয়ে দেন। লোকজন অখুশী হবে এবং তাঁদের আয় কমে যাবে এ কারণে তাঁরা শরী'আতের আহকাম আলোচনা থেকে বিরত থাকেন।[১২]

শিক্ষকদের সমালোচনা করতে গিয়ে এ গ্রন্থে বলা হয়েছ, একজন শিক্ষকের কোনো ছাত্র অধিকতর জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর চেয়ে জ্ঞানী অপর কোনো শিক্ষকের নিকট গেলে তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়। এটা নিস্বার্থ মু'মিনের পরিচয় নয়। একজন মুখলিস 'আলিম বা শিক্ষক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী একজন চিকিৎসকের মতো। এরূপ চিকিৎসক কোনো রোগী অপর কোনো চিকিৎসকের পারমর্শেও আরোগ্য লাভ করলে তাতে খুশী হন। তদ্রুপ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী একন শিক্ষক কোনো ছাত্র অপর কোনো শিক্ষকের থেকে জ্ঞান আহরণ করলে তাতে সন্তুষ্টই হবেন।[১৩]

---

[১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।

[২] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৩৬।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮।

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০; ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাব আল আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬১-৬৬২।

[৬] *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৩৩০; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৪০।

[৭] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৪০।

[৮] *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১।

[৯] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ৪০৯।

[১০] *ইসলামী বিশ্বাকোষ*, ৪র্থ, পৃ. ৩২৪; *দায়িরায়ি মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; *তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

[১১] ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস* (বৈরূত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৯২ খ্রি./১৩১২ হি.), পৃ. ৯৯।

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৫।

[১৩] *প্রগুক্ত*, পৃ. ১১১।

ইবনুল জাওযী শাসকবর্গ সম্পর্কে বলেন, তাঁরা শরী'আতের আহকামের পরিবর্তে নিজেদের মত অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁরা যখন কাউকে অন্যাভাবে শাস্তি দেন অথবা অন্যায়ভাবে হত্যা করেন তখন তাঁরা মনে করেন এটা তো রাজনৈতিক ব্যাপার। রাজনৈতিক ব্যাপারে ইসলামকে অসম্পূর্ণ মনে করে তাঁরা এ ব্যাপারে নিজেদের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইসলাম সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা কুফ্‌রী। কারণ আল্লাহ প্রদত্ব ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ﴾

"আমি আল কুরআনে কোনো বিষয় ছেড়ে দেইনি।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ﴾

"আল্লাহর হুকুম রদ করার সাধ্য কারো নেই।"[২]

সুতরাং ইসলামী শরী'আতের কোনো বিধান রহিত করার ও নতুন বিধান সংযোজন করার কারো কোনো অধিকার নেই।[৩] ইবনুল জাওযী শাসকবর্গের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তারা একদিকে পাপ কাজে নিয়োজিত থাকে অন্যদিকে পাপের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নেককার বান্দাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। অথচ নেককার বান্দাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কখনো পাপের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।[৪] তিনি শসকবর্গের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণার চিত্র তুলে ধরে বলেন, শাসকবর্গ হককানী আলিমদের পরিবর্তে ভণ্ড পীর-ফকীর ও ঢোল তবলাওয়ালা সূফী নামধারীদের সাথে বেশি সম্পর্ক স্থাপন করেন। কারণ হক্কানী 'আলিমরা তাঁদেরকে পাপ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। আর ঐসব ভণ্ড লোকদের সাথেই সম্পর্ক স্থাপনে অধিকতর স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। এসব শাসক সংসারধর্ম পালনকারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কার্যের সাথে সম্পৃক্ত হক্কানী 'আলিমদের তুলনায় এসব ভণ্ড সংসারত্যাগী সূফী নামধারীদেরকে অধিকতর আল্লাহওয়ালা মনে করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদেরকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৫]

ইবনুল জাওযী সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে বলেন, তারা মনে করে তাদের নিজেদের আমলী জিন্দিগী সংশোধন না করে ওয়া'য-নাসীহাত ও যিক্‌রের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি করলেই তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এ শয়তানী ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সবধরণের পাপ কাজও চালিয়ে যাচ্ছে আবার ওয়া'য মাহফিলে গিয়ে কান্নাকাটিও করছে। অথচ তাদের দৈনন্দিন 'আমল সংশোধন করাই ছিল অতীব জরুরি। তিনি বিত্তবানদের সম্পর্কে এ গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ বিত্তবানই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে সুনাম ও সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ, পুল প্রভৃতি নির্মাণ করে তাতে নিজেদের নাম-ফলক স্থাপন করে এবং দান-খয়রাত করে তা প্রচার করে। তাদের চরিত্র এমন যে, যদি তাদেরকে কোনো প্রকার প্রচার ছাড়া একটি সাধারণ দেওয়াল নির্মাণ করতে বলা হয় তাহলে তারা তাতে রাযী হবে না।[৬] এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ মুনীর দিমাশকীর সম্পাদনায় কায়রোর আল-মাতাবা'আতুল মুনীরিয়্যাহ,[৭] সায়্যিদ আল-আরাবীর সম্পাদনায় মাকতাবাতুল ঈমান বিল মানসূরাহ থেকে প্রকাশিত হয়।[৮]

২. সায়দুল খাতির: এ গ্রন্থে ইবনুল জাওযী আপন মনের প্রতিক্রিয়া, অকৃত্রিম স্বভাবসুলভ ধ্যান-ধারণা, জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি নিজের অনেক দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি নিঃসংকোচে স্বীকার করেছেন। এছাড়াও তিনি এ গ্রন্থে আত্মার সাথে কথোপকথন, মানসিক দ্বন্দ্বের বর্ণনা, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, নারী চাকর-চাকরানী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, কল্যাণকর পথ নির্দেশনা, দৈনন্দিন ঘটনাবলী বিশ্লেষণ, আত্মার ব্যাধি, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে পর্যালোচনা, আত্মসমালোচনা প্রভৃতি বিষয় সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থে ইবনুল জাওযীর চিন্তা-চেতনা ও জীবনোপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লিইয়াবযাক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আয়া সুফিয়া (ইস্তাম্বুল)-এ বসরার আল-মাকতাবাতুল 'আব্বাসিয়্যাহ, দারুল কুতুব আল খাদীবিয়্যাহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থটির ফায়যুল খাতির শিরোনামে একটি পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুব আল মিসবিয়্যাহতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে দামিশকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। মুহাম্মাদ আল গাযালীর সম্পাদনায় কায়রোর দারুল কুতুব আল-হাদীসাহ,[৯] 'আব্দুর রহমান আল-বাবর-এর সম্পাদনায় দারুল ইয়াকীন বিল মানসূরাহসহ বিভিন্ন স্থান থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।[১০]

---

[১] *সূরা আল-আন'আম:* ৩৮।
[২] *সূরা আর্-রা'দ:* ৪১।
[৩] *তাবলীসু ইবলীস*, পৃ. ১১২।
[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৪।
[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।
[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৯-৩৪২।
[৭] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ ৮৬।
[৮] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৫০।
[৯] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১১৮-১১৯।
[১০] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৪৯।

৩. কিতাবুল হাস্‌সি ‘আলা হিফযিল ‘ইলম: গ্রন্থটির একধিক নাম পাওয়া যায়। এ নামটি ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লিখিত হয়েছে।[১] ব্রুকলম্যান আল-হাসসু ‘আলা হিফযি তালাবিল ‘ইল্‌ম শিরোনামে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন।[২] গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোপরূল গ্রন্থাগার (ইস্তম্বুল) ও দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৩] এতে ইবনুল জাওযী কুরআন ও হাদীস মুখস্ত করার উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মুসলিম জাতি নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী মুখস্ত কারার কারণেই অপরাপর জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। এরপর তিনি ধর্মীয় গ্রন্থাবলী মুখস্ত করার জন্য মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারী খাবার ও ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি অক্ষরের ক্রমানুসারে প্রখ্যাত হাফিযদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।[৪] এটি ফুয়াদ আব্দুল মুন‘ঈম আহামাদ-এর সম্পাদনায় আকেজান্দ্রিয়ার দারুদ দা‘ওয়াহ থেকে ১৯৮৩ খ্রি./১৪০৩ হিজরিতে প্রকাশিত হয়।[৫]

৪. বুস্তানুল ওয়া‘ইযীন ওয়া রিয়াযুস সামি‘ঈন: এ গ্রন্থটি আশরাফ ‘আলী কায়রো থেকে ১৯৩৪ খিষ্টাব্দে এবং কায়রো মাহমূদ ‘আলী আল মাতবা‘আতুল আরাবিয়্যাহ, থেকে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুব আল খাদীবিয়্যাহ, দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ ও বার্লিন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৬]

৫. ইয়াকূতাতুল মাওয়া‘ইয ওয়াল মাও‘ইযাহ: এটি কায়রোর আল-মাতবা‘আতুল মায়মানিয়্যাহ থেকে ১৩০৯ ও ১৩২২ হিজরিতে প্রকাশিত হয়।[৭] এতে বক্তৃতা সম্পর্কে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং এ সব পরিচ্ছেদে নমুনাস্বরূপ সুবিন্যাস্ত বক্তৃতামালা সন্নিবেশিত হয়েছে।[৮] এটি আয যিরিকলী ‘আল-ইয়াকুত’ নামে শিরোনামে এবং হাজী খলীফা ‘ইয়াকুতাতুলমাওয়ায়ি‘য’ শিরোনামে উল্লেখ করছেন।[৯]

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

[১] *ইসলাম বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
[২] ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাব আল-আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬১-৬৬২।
[৩] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৯৩।
[৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; *দায়িরায়ি মা‘আরিফি ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।
[৫] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ৪০৪।
[৬] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ৭৫-৭৬।
[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।
[৮] *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪৮-২০৪৯।
[৯] *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪৮; আয-যিরিকলী, *আল-আ‘লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

জান্নাতে একটি ঘর

[১৫ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে এই দু‘আ পড়ে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য দশ লক্ষ নেকি লেখেন, দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন, দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়ান এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন।”[১০] বাজার সাধারণত গাফলতির স্থান। সেখানে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্য এর সওয়াব ও প্রতিদান অনেক বেশি।

৯. তর্ক ত্যাগ, মিথ্যা বর্জন, উত্তম চরিত্র:

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ».

আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক ত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের নিচের স্তরে একটি ঘর; যে ব্যক্তি মিথ্যা ত্যাগ করে– তার জন্য মধ্যম স্তরে একটি ঘর; আর যার চরিত্র উত্তম –তার জন্য সর্বোচ্চ জান্নাতে একটি ঘর।”[১১]

১০. কাউকে খাবার খাওয়ানো, বেশি বেশি সালাম প্রদান করা ও রাতের সলাত আদায় করা:

عن أبي مالك الأشعري (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يُرى ظاهِرُها مِنْ باطنها، وباطِنُها مِنْ ظاهِرِها، أعدَّها اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطعامْ، وأَفْشى السلامْ، وصلَّى باللَّيلِ والناسُ نِيامْ".

আবূ মালিক আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “জান্নাতে এমন ঘর রয়েছে যার ভিতর বাইরে থেকে এবং বাইরে ভিতর থেকে দেখা যায়। আল্লাহ তা‘আলা এগুলো তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা খাবার খাওয়ায়, সালাম প্রচার করে এবং রাতে মানুষ ঘুমালে সালাত পড়ে।”[১২]

আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাদের সবাইকে সকল ফরয ‘আমল করার পাশাপাশি উক্ত ‘আমলগুলো করে জান্নাতে একটি ঘর করে নেওয়ার তাওফীক্ব দান করেন –আমীন।

[১০] *সহীহুল জামে‘- হা. ৬৩৩১; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪২৮, হাসান; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৩৫, হাসান।*
[১১] *সহীহ আবূ দাউদ- হা. ১৮০০।*
[১২] *সহীহ আত-তারগীব- হা. ৬৮, মা. শা., হা. ৬১৮/৬।*

قصص الحديث / ক্বাসাসুল হাদীসঃ

কিয়ামতের দিন রাসূল (ﷺ)-ই একমাত্র সুপারিশকারী

আবু তাহসীন মুহাম্মদ

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে (হাশ্‌রের ময়দানে) আটকে রাখা হবে। এতে তারা খুব চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়বে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে সুপারিশ করাই তাহলে হয়তো (বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে) আরাম পেতে পারি। তাই তারা আদম (আলাইহিস সালাম) -এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সব মানুষের পিতা। আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, ফেরেশ্‌তাদের দিয়ে সিজদাহ্ করিয়েছিলেন এবং সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্ত করে আরাম দান করেন। তখন আদম (আলাইহিস সালাম) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। নবী (ﷺ) বলেন, তিনি [আদম (আলাইহিস সালাম)] গাছ থেকে (ফল) খাওয়ার গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন, যা তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল; (তিনি বলবেন,) বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত সর্বপ্রথম নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও।

সুতরাং তারা সবাই নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন, যা তিনি করেছিলেন অর্থাৎ- না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন; (তিনি বলবেন,) বরং তোমরা মহান আল্লাহর খলীল ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও।

সুতরাং তারা সবাই ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসলে তিনি যে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন এর কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই; (তিনি বলবেন,) বরং তোমরা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাও। তিনি মহান আল্লাহর এমন এক বান্দাহ যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত কিতাব দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে গোপনে কথা বলে নৈকট্য দান করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সবাই তখন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসলে তিনি একজনকে হত্যা করে যে গুনাহ করেছেন এর কথা উল্লেখ করবেন (এবং বলবেন,) তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালিমা ও রূহ্ ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তখন তারা সবাই 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদের কাছে যাও। তিনি মহান আল্লাহর এমন এক বান্দাহ যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারা আমার কাছে আসলে আমি আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখবো তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত চাইবেন এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ (ﷺ) মাথা উঠাও। আর বলো, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি সুপারিশ করো তা কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো যা চাইবে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তবক-স্তুতি করবো যা তিনি সে সময়ে আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি শাফা'আত করবো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে আসবো।

হাদীসের বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ্ বলেন, আমি আনাসকে একথাও বলতে শুনেছি যে, আমি মহান আল্লাহর দরবার থেকে বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব। তারপর আমি ফিরে আসবো এবং আমার রবের ঘরে (জান্নাতে) তাঁর কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখনই তাঁকে দেখবো, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত চাইবেন এ অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! (ﷺ) মাথা উঠাও। আর বলো, তোমার কথা শোনা হবে। শাফা'আত করো কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা করো (যা প্রার্থনা করবে তা) দেয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন

প্রশংসা ও স্তবক-স্তুতি করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি শাফা'আত করবো। এ ব্যাপারে তিনি আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দিবেন। আমি তখন (মহান আল্লাহর ঘর অর্থাৎ- জান্নাত থেকে) বের হবো এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব।

হাদীস বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ্ বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি যে, [নবী (ﷺ) বলেছেন,] তখন আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইবো। আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাকে (রবকে) দেখবো সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ পর্যন্ত চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বলো, যা বলবে তা শোনা হবে, শাফা'আত করো তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো। যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন হামদ ও সানা করবো, যা তিনি আমাকে সেই সময় শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারপর আমি শাফা'আত করবো। আল্লাহ তা'আলা এক্ষেত্রে আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিবেন। তখন আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। হাদীস বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ্ বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি যে, [নবী (ﷺ) বলেছেন,] আমি সেখান থেকে বের হব, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব। অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকে রাখবে অর্থাৎ- যাদের জন্য (কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী) চিরস্থায়ী জাহান্নামবাস নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা ছাড়া আর কেউ-ই জাহান্নামে থাকবে না। বর্ণনাকারী আনাস বলেন, এরপর নবী (ﷺ) কুরআনের আয়াত– "আশা করা যায়, আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে 'মাকামে মাহ্মূদে' পৌঁছে দিবেন।' তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এটিই সেই 'মাকামে মাহমূদ' তোমাদের নবীকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।"[১২৮]

শিক্ষা: হাদীসটির মৌলিক শিক্ষা হলো হাশ্রের মাঠে দুনিয়ার কোনো ওলী-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ এমনকি নবীরাও কারো জন্য কোনো সুপারিশ করতে পারবে না একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাড়া।

[১২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪৪০।*

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন:

لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه.

"হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞানের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান; তবে এ শাস্ত্রে আহলে কিতাবিরা আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।" *(সিয়ারু আ'লামীন নুবালা- ইমাম যাহাবী, ১০/৫৭)*

لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك، ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك.

"তুমি এমন শহরে বসবাস করো না যেখানে তোমার দ্বীনের বিষয়ে ফাতাওয়া বা নির্দেশনা দেওয়ার মতো কোনো আলেম নেই এবং তোমার স্বাস্থ্যগত বিষয়ে অবহিত করার মতো কোনো চিকিৎসক নেই।" *(আদাবুশ্ শাফে'য়ী ওয়া মানাক্বিবুহ- পৃ. ২৪৪)*

আল্লামা মোহাম্মদ 'আব্দুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন:

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতিত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

خواطر / হৃদয়কথনঃ

সায়রে সমর্পণ

আব্দুল মোমেন

'সম্পর্ক' শব্দটি সংস্কৃত মূল থেকে আগত একটি অত্যন্ত গভীর অর্থবহ শব্দ। শব্দটি সংস্কৃত **সম্-পৃচ্ + অ** থেকে উৎপন্ন। সম্পর্ক মানে কেবল পাশে থাকা নয়; এর আদি অর্থ হলো– **'সম্যক স্পর্শ'**। অর্থাৎ- যখন একজনের সুখ-দুঃখ অন্যজনের হৃদয়ে গিয়ে সরাসরি আঘাত করে বা প্রশান্তি দেয়, তখনই সেখানে প্রকৃত সম্পর্কের জন্ম হয়।

আমরা প্রায়ই আমাদের অধিকার না পেলে দায়িত্ববান হতে চাই না। যার কারণে আমাদের সম্পর্কগুলোতে প্রশান্তি অনুভব করতে পারি না। আমাদের উচিত দায়িত্ব ও অধিকারকে আলাদাভাবে দেখা। একটি সম্পর্কের স্থায়িত্ব নির্ভর করে 'অধিকার' এবং 'দায়িত্ব'-এর ভারসাম্যের ওপর। আমরা যখন কেবল নিজের অধিকার নিয়ে ভাবি, তখন সম্পর্কে ফাটল ধরে। আর যখন আমরা একে অপরের প্রতি দায়িত্বকে 'ইবাদত বা পবিত্র কাজ হিসেবে গণ্য করি, তখনই সেই সম্পর্ক 'সায়রে সমর্পণ'-এর মতো গভীর হয়। অর্থাৎ- আমি আমার দায়িত্ব পালন করবো, অধিকারের দোহাই দিয়ে দায়িত্ব পালন থেকে দূরে থাকবো না। আমি যদি পূর্ণভাবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি, তবে অন্যের অধিকার পূর্ণরূপে সে প্রাপ্ত হবে। আমরা সকলেই যদি এভাবে চিন্তা করি, তবে আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না; প্রত্যেকেই যার যার অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যাবে।

একটি সফল জীবনের জন্য দু'টি সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। প্রথমটি হলো খালিক বা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক; যেখানে স্রষ্টার থাকে পূর্ণ অধিকার আর সৃষ্টির থাকে কেবল নিরঙ্কুশ দায়িত্ববোধ এখানে স্রষ্টাই সম্পর্কের একমাত্র প্রভাবক। এটি হলো দাসত্বের এবং মায়ার সম্পর্ক। স্রষ্টা আমাদের প্রতিপালক, আর আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী সৃষ্টি। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক অনেকটা দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্কের মতো। স্রষ্টা তাঁর নূর বা রহমত দিয়ে আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছেন। মানবাত্মা মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা এক পবিত্র আমানত, তাই এটি অবিনশ্বর। মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মার ধ্বংস হয় না; বরং এটি কেবল পটপরিবর্তন ও স্থানান্তরিত হয় মাত্র। এভাবে একসময় আত্মা পৌঁছে যাবে সেই পরম মুক্তির পথে, যেখানে রয়েছে স্বর্গীয় সুখের চেয়েও বড় প্রশান্তি-স্রষ্টার সান্নিধ্য। স্রষ্টাকে পাওয়ার এই যে অন্তহীন ব্যাকুলতা এবং তাকে অনুভবে পাওয়ার তৃপ্তি, তা-ই আমি আমার এই কাব্যে ব্যক্ত করেছি–

নিরাকার নও, সাকার তুমি উপমাহীন মুখ,
দেখিনি কভূ তোমায় আমি অনুভবেই এত সুখ!
স্বর্গ তোমার হাতের তৈরি সুখের অন্ত নাই,
সেথায় গেলেই মিলে তব দেখা, তাই সেথায়ই যেতে চাই।
স্বর্গে গিয়েও তব দেখাই চাই অসীম সুখের লাগি,
তাই তো আমার এই উপাসনা দিন-রাত সদা জাগি।

বস্তুত, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো 'তাওয়াক্কুল' (ভরসা) এবং 'ইশক' (ভালোবাসা)। এই সম্পর্কটি যখন মজবুত হয়, তখন মানুষের ভেতরের শূন্যতা পূর্ণ হয়ে যায়। স্রষ্টার সাথে এই নিবিড় যোগসূত্র মানুষকে শেখায় যে, পৃথিবীতে কেউ পাশে না থাকলেও তিনি আছেন। যিনি হৃদয়ের গোপন অভিব্যক্তিটিও শোনেন। এটি আত্মার জন্য একটি **'নিরাপদ নোঙর'**, যা জীবনে কঠিন ঝড়ের কবলে পড়লেও আমাদের স্থির রাখে।

দ্বিতীয়টি হলো– মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক। মহান স্রষ্টা মানবজাতির নাম দিয়েছেন 'ইনসান', যা আরবি 'ইনসান (إنسان)' শব্দটি 'উনস (أنس)' মূল ধাতু থেকে এসেছে 'উনস' শব্দের অর্থ হলো ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা, প্রেম, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন। অর্থাৎ- মানুষ এমন এক সৃষ্টি যার স্বভাবই হলো অন্যের সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। নামের এই সার্থকতা থেকেই বোঝা যায়, মানুষ একা থাকার জন্য নয়; বরং পারস্পরিক হৃদ্যতার মাধ্যমেই তার পূর্ণতা পায়। তবে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির এই সুন্দর সম্পর্কের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের ওপর আমরা যখন মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে নয়; বরং 'স্রষ্টার সৃষ্টি' হিসেবে সম্মান করি, তখন

সেই সম্পর্কের ধরন বদলে যায়। স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি দয়া করা আসলে স্রষ্টাকেই ভালোবাসার একটি রূপ। যদি কারো স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক গভীর হয় কিন্তু সৃষ্টির সাথে (যেমন- পরিবার, প্রতিবেশী) সম্পর্ক তিক্ত হয়, তবে তার স্রষ্টার সাথেও সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিকতা হয় অপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে, স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক হলো মূল শিকড়, আর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক হলো তার ডালপালা। শিকড় মজবুত হলে যেমন ডালে সুন্দর ফুল-ফল ধরে, তেমনি স্রষ্টার প্রতি সমর্পণ যার যত গভীর, সৃষ্টির প্রতি তার মমতা ও দায়িত্ববোধও তত নিখুঁত। এই দর্শনেরই প্রতিফলন দেখা যায় বিখ্যাত দার্শনিক **'ইমাম আল-গাজ্জালি** (রাহিমাহুল্লাহ)'র চিন্তায়। তিনি মনে করতেন, স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করাই হলো নৈতিকতার মূল ভিত্তি; কারণ যে ব্যক্তি মূল উৎস বা স্রষ্টার সাথে বিচ্ছিন্ন, তার পক্ষে সৃষ্টির প্রতি নিখুঁত ভালোবাসা প্রদর্শন করা অসম্ভব। এই দুই সম্পর্কের মোহনাতেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত প্রশান্তি। যেকোনো সম্পর্কের সার্থকতা বুঝতে হলে সবার আগে সেই মহান সত্তার পরিচয় জানা প্রয়োজন, যিনি সম্পর্কের এই মায়া মানুষের হৃদয়ে বুনে দিয়েছেন। **সূফি দার্শনিক ইবনু আরাবীর** মতে, প্রতিটি মানুষ মহান স্রষ্টার গুণের এক একটি দর্পণ। তাই মানুষকে সম্মান করা মানে স্রষ্টাকেই সম্মান করা। এই আধ্যাত্মিক মর্যাদাবোধের সাথে আধুনিক চিন্তার এক চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন- অক্সফোর্ড একাডেমিক (Oxford Academic)-এর গবেষণায় মানুষের মর্যাদাকে (Human Dignity) কেবল একটি আইনি কাঠামো নয়; বরং প্রতিটি মানুষের সহজাত মূল্যবোধের স্বীকৃতি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যখন মানুষকে 'স্রষ্টার অনবদ্য সৃষ্টি' হিসেবে গণ্য করা হয়, তখন সেই উচ্চতর মর্যাদাবোধই মানবিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধের ধরন আমূল বদলে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, জীবনের বড় প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে রবার্ট সি. সলোমন তাঁর 'The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, দর্শন কেবল শুষ্ক যুক্তি নয়; বরং এটি আমাদের অস্তিত্বের অর্থ খোঁজার এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা কেবল জাগতিক প্রাপ্তিতে নয়; বরং নৈতিক মূল্যবোধ এবং এক উচ্চতর সত্যের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাঝে নিহিত। তাঁর এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের শেখায় যে, যখন আমরা নিজেদের একটি বৃহত্তর মহাজাগতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখি, তখনই আমাদের ভেতরের অস্থিরতা দূর হয় এবং জাগতিক এক গভীর আত্মিক প্রশান্তি জন্ম নেয়। এটিই হলো আমার এই লেখায় 'সায়রে সমর্পণ'-এর মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি। যেখানে ক্ষুদ্র সত্তা মহান সত্তার মাঝে নিজের আশ্রয় খুঁজে পায়। যখন মানুষকে 'স্রষ্টার অনবদ্য সৃষ্টি' হিসেবে গণ্য করা হয়, তখন সেই উচ্চতর মর্যাদাবোধই মানবিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধের ধরন আমূল বদলে দেয়। স্রষ্টা কেবল আকাশ-জমিনের স্রষ্টাই নন, তিনি পরম 'সুহৃদ' এবং 'ওয়াদুদ' (অত্যধিক ভালোবাসাকারী)। যখন পৃথিবীর সব সম্পর্ক স্বার্থের বা প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে মাপা হয়, তখন তাঁর সাথে বান্দার সম্পর্কটি হয় নিঃশর্ত। **জালাল উদ্দিন রুমি** যেমনটি বলেছিলেন, 'মানুষ সমুদ্রের একটি বিন্দু নয়; বরং সে একটি বিন্দুর মধ্যে থাকা বিশাল এক সমুদ্র,' অর্থাৎ- স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণের মাধ্যমেই মানুষ তার ভেতরের অসীম সম্ভাবনা ও সত্যিকারের মর্যাদা খুঁজে পায়। তিনি আমাদের সেই পরম আশ্রয়, যিনি আমাদের অসম্পূর্ণতাগুলো জানেন, তবুও ঘৃণা করেন না; বরং ক্ষমার চাদরে ঢেকে রাখেন। সম্পর্কের এই যে 'সম্যক স্পর্শ' আমরা খুঁজি, তার আদি উৎস তিনিই। তাই তাঁর পরিচয় জানা মানেই হলো ভালোবাসার আসল কেন্দ্রবিন্দুকে খুঁজে পাওয়া, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে পৃথিবীর অন্য সব মানবিক সম্পর্কের ইমারত।

সম্পর্ক কোনো স্থির বিন্দু নয়; বরং এটি এক বহমান নদীর মতো; যার একদিকে থাকে অধিকারের টান, আর অন্যদিকে ত্যাগের মহিমা। একটি সুন্দর সম্পর্ক কেবল দু'জনের একসাথে থাকা নয়; বরং একে অপরের অসম্পূর্ণতাকে মমতা দিয়ে পূর্ণ করার নাম। যেখানে ভালোবাসা সমুদ্রের মতো গভীর হয়, সেখানে ছোটখাটো বিবাদের ঢেউগুলো বালুচরের ধাক্কার মতোই মিলিয়ে যায়। মনে রাখা জরুরি, সম্পর্কের বুনন যদি বিশ্বাসের সুতোয় হয়, তবে সময়ের ঝাপটা সেই বাঁধন ছিঁড়তে পারে না; বরং তা আরো দুর্ভেদ্য করে তোলে।

আধুনিক সময়ের অনেক বিভ্রান্ত মন স্রষ্টাকে অস্বীকার করে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করতে চায়। কিন্তু সত্য এই যে, স্রষ্টাহীন জগত আসলে এক বিশাল শূন্যতা। নাস্তিক্যবাদ মানুষের অস্তিত্বকে কেবল একগুচ্ছ কোষের সমষ্টি বা দৈব দুর্ঘটনার ফসল হিসেবে দেখে। যদি এই

সৃষ্টি কেবলই দুর্ঘটনা হয়, তবে সম্পর্কের মায়া, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা কিংবা ত্যাগের মহিমা এ সবই অর্থহীন রাসায়নিক বিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে কোনো স্রষ্টা নেই, সেখানে কোনো শাশ্বত নৈতিকতা নেই, নেই কোনো পরম আশ্রয়। পক্ষান্তরে, আস্তিকতা আমাদের শেখায়– আমরা কোনো উদ্দেশ্যহীন ধূলিকণা নই। আমাদের হৃদয়ে সম্পর্কের যে 'সম্যক স্পর্শ' অনুভব করি, তা পরম দয়ালু স্রষ্টার পক্ষ থেকে দেওয়া এক মহৎ আমানত। নাস্তিক্যবাদ মানুষকে দেয় একাকীত্ব আর অস্তিত্বের সংকট, আর স্রষ্টায় সমর্পণ মানুষকে দেয় এক অজেয় শক্তির সান্নিধ্য। যারা মনে করে স্রষ্টাকে অস্বীকার করলেই স্বাধীনতা মেলে, তারা আসলে জীবন-সমুদ্রের মাঝখানে কম্পাসহীন এক নৌকার মতো।

নাস্তিক্যবাদ দাবি করে এই মহাবিশ্ব এবং এর সূক্ষ্ম সম্পর্কগুলো স্রেফ এক 'সুযোগ' বা 'দুর্ঘটনা'। কিন্তু যুক্তির তুলাদণ্ডে এটি ধোপে টেকে না। একটি অতি সাধারণ ঘড়ির কাঁটা যখন সময়ের নির্ভুল হিসেব দেয়, আমরা অবলীলায় বিশ্বাস করি এর একজন দক্ষ কারিগর আছে। অথচ কয়েক বিলিয়ন নিউরন আর অগণিত আবেগ দিয়ে গড়া মানুষের এই জটিল মস্তিষ্ক কিংবা হৃদয়ের গভীর মায়া কোনো কারিগর ছাড়া আপনাআপনি তৈরি হয়েছে এমনটা ভাবা কি চরম অযৌক্তিক নয়? সমুদ্রের তীরে বালুর ওপর পায়ের ছাপ দেখলে আমরা নিশ্চিত হই যে কেউ এখান দিয়ে হেঁটে গেছে; তবে এই সুবিশাল মহাবিশ্বে স্রষ্টার অস্তিত্বের অজস্র নিশান দেখেও যারা তাঁকে অস্বীকার করে, তারা আসলে অবিশ্বাসের ঘন আবরণে তাদের চোখ ঢেকে রাখে।

নাস্তিক্যবাদ মানুষের হৃদয়কে এক যান্ত্রিক রোবটে পরিণত করে, যেখানে 'ভালোবাসা' কেবল একটি হরমোনের খেলা। কিন্তু যখন একজন মা তার নিজের আহার সন্তানের মুখে তুলে দেন, কিংবা একজন মানুষ অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, তখন সেই ত্যাগের পেছনে কাজ করে এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা, যা কোনো জড়বাদী দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারে না। স্রষ্টায় সমর্পণই মানুষকে এই পশুসুলভ জড়বাদ থেকে মুক্তি দেয়। স্রষ্টা যখন আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হন, তখন আমরা বুঝতে পারি, আমরা একা নই। এই বিশাল 'সায়র' বা জীবন-সমুদ্রে তিনি কেবল একজন পর্যবেক্ষক নন; বরং তিনি প্রতিটি ঢেউয়ের মাঝে আমাদের হাত ধরে আছেন। তাই স্রষ্টার প্রতি আকর্ষণ কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়; বরং এটিই হলো সৃষ্টির পরম বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগীয় পূর্ণতা।

স্রষ্টা যখন সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হন, তখন ভালোবাসা কেবল সাময়িক আবেগ থাকে না, তা হয়ে ওঠে 'ইবাদত। যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তার সব কাজ স্রষ্টা দেখছেন, তখন সে কেবল আইনের ভয়ে নয়, বরং স্রষ্টার প্রতি প্রেমের টানেই পরিবারের প্রতি দয়ালু হয়। স্রষ্টার প্রতি এই আকর্ষণই মানুষকে পশুর স্তর থেকে তুলে মহত্ত্বের শিখরে পৌঁছে দেয়। তাই **'সায়রে সমর্পণ'** কোনো সীমাবদ্ধতা নয়; বরং এটিই হলো অসীম মুক্তি এবং প্রশান্তির একমাত্র মোহনা।

আমরা প্রায়ই সুখ আর প্রশান্তিকে এক করে ফেলি, অথচ এই দু'টির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সুখ নির্ভর করে বাইরের পরিস্থিতির ওপর। একটু ভালো খাবার, ভালো পোশাক বা সম্পদ আমাদের সাময়িক সুখ দেয়। কিন্তু আত্মিক প্রশান্তি হলো হৃদয়ের এমন এক গভীর স্থিরতা, যা বাইরের কোনো ঝড়ের ওপর নির্ভর করে না। এই প্রশান্তি কেবল তখনই অর্জিত হয় যখন মানুষের ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলো স্রষ্টার বৃহত্তর ইচ্ছার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

স্রষ্টার সায়রে নিজেকে সমর্পণ করা মানেই হলো নিজের ভেতরের সব অস্থিরতা, ভয় আর না-পাওয়ার বেদনাকে তাঁর হাতে সঁপে দেওয়া। যখন একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে, যা কিছু তাঁর জীবনে ঘটছে তা পরম দয়ালু স্রষ্টার সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ, তখন তার হৃদয় থেকে সব অভিযোগ মুছে যায়। এই 'মেনে নেওয়া' বা সন্তুষ্টিই হলো প্রশান্তির আসল চাবিকাঠি। আত্মিক প্রশান্তি কোনো নির্জন পাহাড়ে গিয়ে পাওয়া যায় না; বরং এটি পাওয়া যায় স্রষ্টার প্রতি অগাধ আস্থায়। যখন হৃদয় স্রষ্টার স্মরণে সজীব থাকে, তখন সংসারের হাজারো কোলাহলের মাঝেও এক গভীর নীরবতা ও প্রশান্তি বিরাজ করে। সমর্পণই সেই মোহনা, যেখানে মানুষের অস্থির আত্মা অবশেষে তার পরম আশ্রয় খুঁজে পায়। মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার তৃষ্ণা চিরন্তন। এই আকুতিকে আমি আমার এক কবিতায় এভাবে বলেছি–

কে না চায় প্রেম, ওগো! ভালোবাসা চায় না কে?
আমিও তাই চাই, দয়া করে এটুকু দে!
জানি পৃথিবীর সব মিথ্যে, মিথ্যা পৃথিবীর দুঃখ-সুখ,
সত্য শুধু প্রেম-ভালোবাসা তাই দাও করো না বিমুখ।
প্রেম ছাড়া শূণ্য সব, শূণ্য এ হৃদয়,
তাই বলি প্রেম দাও, প্রেম দাও, হে প্রেমময়!

الثقافة-غير الثقافة / সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি:

ওলিমার কিছু সুন্নাত

জান্নাতুল মহল*

এক. বিবাহের পর তিন দিন পর্যন্ত ওলীমা করা।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) সাফিয়্যাকে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণকে তার মোহর হিসেবে নির্ধারণ করলেন। আর (বিবাহের দিন থেকে পরবর্তী) তিনদিন ওলীমা খাওয়ালেন।

দুই. ওলীমার জন্য সৎ ব্যক্তিদের দা'ওয়াত দেওয়া; চাই তারা গরীব বা ধনী হোক। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর বাণীর ভিত্তিতে– "তুমি শুধুমাত্র মু'মিন ব্যক্তির সাথী হবে, আর শুধুমাত্র আল্লাহ ভীরুরা তোমার খাদ্য খাবে।"[১]

তিন. এক বা একাধিক ছাগল দিয়ে ওলীমা দেওয়া; যদি সক্ষমতা থাকে। না থাকলে যেটুকু আয়োজন সম্ভব তাই করা।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বিবি সাফিয়্যার ওলীমাতে আমি মুসলমানদের দা'ওয়াত দিলাম। ওলীমাতে রুটি-গোশ্ত ছিল না। আমি চামড়ার একটি দস্তরখানা বিছিয়ে দিলাম। (অপর বর্ণনায় আছে– আমি একটা সমতল জায়গা খুঁজলাম, একটি চামড়ার দস্তরখানা আনা হলো, আর তা আমি সেই সমতল ভূমিতে বিছিয়ে দিলাম) লোকজন তাতে খেজুর, পনির, ঘি রাখল (অতঃপর মানুষ তৃপ্তির সাথে খেলো)।[২]

চার. ধনীদের নিজ নিজ সম্পদ (খাবার) নিয়ে ওলীমায় শরীক হওয়া। ওলীমার অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য লোকেরা তাদের সম্পদ (খাবার)-সহ শরীক হওয়া মুস্তাহাব। বরের ওলীমা আয়োজনের সক্ষমতা না থাকলে তার পক্ষে অন্যদের আয়োজন করা উত্তম কাজ।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ)-এর সাথে বিবি সাফিয়্যার বিয়ের ওলীমাতে আমি মুসলমানদের দা'ওয়াত দিলাম। ওলীমাতে রুটি-গোশ্ত ছিল না। ... একটি চামড়ার দস্তরখানা আনা হলো, আর তা আমি সেই সমতল ভূমিতে বিছিয়ে দিলাম) লোকজন তাতে খেজুর, পনির, ঘি রাখল (অতঃপর মানুষ তৃপ্তির সাথে খেলো)।[৩]

পাঁচ. শুধু ধনীদেরকে দা'ওয়াত দেওয়া নিষিদ্ধ। গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে ওলীমায় দা'ওয়াত দেওয়া অনুচিৎ ও অনৈতিক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী হলো– "খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওলীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দা'ওয়াত দেওয়া হয়। আর ওলীমার দা'ওয়াত যে কবুল করল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতা করল।"[৪]

মোটকথা, ওলীমা খাওয়ার স্থানে দা'ওয়াত দানকারীকে সাধারণভাবে সকলকে দা'ওয়াত দেওয়া উচিৎ।

ছয়. ওলীমার দা'ওয়াতে যাওয়া আবশ্যক। যাকে ওলীমার দা'ওয়াত দেওয়া হবে তার জন্য ওলীমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। এটি সাধারণভাবে একজন মুসলিমের হক তথা অধিকার। এ সম্পর্কে দু'টি হাদীস,

১. "তোমরা দাস মুক্ত করো। মেজবানের (দা'ওয়াত দানকারীর) দা'ওয়াতে তোমরা সাড়া দাও এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাও।"[৫]

২. "তোমাদের কাউকে যদি ওলীমাতে দা'ওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে আসে। যে ব্যক্তি দা'ওয়াতে গেল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য হলো।"[৬]

সাত. রোযাদার হলেও দা'ওয়াতে যাওয়া। যাকে ওলীমার দা'ওয়াত প্রদান করা হয়েছে তিনি রোযাদার হলেও তার দা'ওয়াতে যাওয়া উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

---

* *দাঈ ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।*

[১] *ফাতুহুল বারী- পৃ. ৯/১৯৯।*
[২] *সহীহুল বুখারী- ৭/৩৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪/১৪৭।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- ৭/৩৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪/১৪৭।*
[৪] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- ৯/১৯৮।*
[৬] *সহীহুল বুখারী- ৯/১৯৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৪/১৫২।*

বলেছেন, “যখন তোমাদের কাউকে কোনো খাদ্যের জন্য দা'ওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন তাতে যায়। যদি রোযাদার না হয় তাহলে যেন খায়। আর রোযাদার হলে যেন দু'আ করে।”[১]

আট. ওলীমার দা'ওয়াতে মেজবানের খুশির জন্য রোযাদার ব্যক্তির ইফতার করা। দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি নফল রোযা রাখলে মেজবান তথা দা'ওয়াতকারীকে খুশি করার জন্য ইফতার করা যেতে পারে। বিশেষ করে যখন মেজবান পীড়াপীড়ি বা অনুরোধ করে তখন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ইফতার করা সৌজন্যতা।

হাদীস– ১. “যখন তোমাদের কাউকে খাবার দেওয়া হয় তখন সে যেন তাতে খায়। যদি ইচ্ছা হয় খাবে, আর যদি ইচ্ছা না হয় পরিত্যাগ করবে।”[২]

২. “নফল রোযা পালনকারী নিজের প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে আর ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গবে।[৩]

নয়. বিয়ের অনুষ্ঠানে ছবি না তোলা এবং গান বাজনা না করা। কারণ ছবি ও গান বাজনার সংস্কৃতিতে রহমত ও বরকত নেই; বরং তা অভিশাপের কারণ। আবূ মাস'ঊদ 'উক্ববাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, এক লোক তার জন্য খাদ্য তৈরি করল তারপর তাকে দা'ওয়াত দিলো। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন, এমনকি ছবি ভেঙ্গে ফেলা হলো। এরপর তিনি প্রবেশ করলেন।[৪]

এছাড়া ইমাম আওযায়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেছেন, “আমরা ঐ ওলীমাতে যাই না যাতে তবলা ও বাদ্য যন্ত্র থাকে।”[৫]

দশ. দা'ওয়াতে উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণ ও বরকত কামনায় দু'আ করা। যে ব্যক্তি দা'ওয়াতে উপস্থিত হবে তার জন্য দু'টি কাজ করা মুস্তাহাব:

১. মেজবানের জন্য খাওয়া শেষে দু'আ করা: 'আব্দুল্লাহ ইবনু বিসর হতে বর্ণিত, তার পিতা নবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য খাদ্য তৈরি করলেন এবং তাকে দা'ওয়াত দিলেন। তিনি দা'ওয়াত গ্রহণ করলেন। যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন বললেন,

“হে আল্লাহ! তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদেরকে রহম করো, তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছো তাতে বরকত দাও।”[৬]

২. মেজবান ও তার স্ত্রীর জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করা:

“হে আল্লাহ! তাদের উভয়ের মাঝে বরকত দাও এবং তাদের জন্য বাসরে বরকত দাও।”[৭]

“তোমার বিবাহ কল্যাণ ও বরকতময় এবং মঙ্গলময় ভাগ্য হোক।”[৮]

“আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ও তোমার ওপর বরকত দিন আর তোমাদের মাঝে উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠুক।”[৯]

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন:

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ
عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

“সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।” (শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

---

১ *সহীহ মুসলিম- হা. ৪/১৫৩; সুনান আন্ নাসায়ী- ৬৩/২; মুসনাদ আহমাদ- ২/৫০৭।*
২ *সহীহ মুসলিম; মুসনাদ আহমাদ- ৩/৩৯২।*
৩ *সুনান আন্ নাসায়ী- ৬৪/৪; মুস্তাদরাক হাকিম- ১/৪৩৯।*
৪ *বাইহাক্বী- ফতুহুল বারী, ৯/২০৪।*
৫ *আবুল হাসান হারবী আল ফাওয়ায়িদুল মুনতাকাহ- ৪/৩/১, সনদ সহীহ।*
৬ *সহীহ মুসলিম- ৬/১২২; সুনান আবূ দাঊদ- ২/১৩৫।*
৭ *ইবনু সা'দ- ৮/২০-২১; ত্ববারানী কাবীর- ১/১২১/১, সনদ হাসান।*
৮ *সহীহুল বুখারী- ৯/১৮২; সহীহ মুসলিম- ১/১৪১; বাইহাক্বী- ৭/১৪৯।*
৯ *সুনানে সা'ঈদ ইবনু মনসুর- হা. ৫২২; আবূ দাঊদ- ৩/৩৩২; হাকিম বলেছেন হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।*

سفر\ زيارة / ভ্রমণ কাহিনীঃ

গৃহে ফেরা

মো. তানভির ইসলাম

মানুষের জীবনে যত যাত্রা, ততই গল্প। আর সেই গল্পের ভিতরেই লুকাইয়া থাকে হাসি, আফসোস, শিক্ষা আর অদৃষ্টের অদৃশ্য পরিহাস। ঈদ আসিলেই বাঙালি জাতির মনে এক অদ্ভুত উল্লাসের ঢেউ জাগিয়া উঠে। উহার কথা মনে উদিত হইলেই অফিসের ফাইল, বসের ভ্রুকুটি, মাসের শেষে হিসাবের খাতা আর দৈনন্দিন ব্যস্ততার বোঝা যেন মুহূর্তের মধ্যেই গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত পথ যেন একত্র হইয়া গিয়াছে-শুধু গৃহের দিকে। জীবন মানেই শুধু গৃহে ফিরা, মায়ের হাতের রান্না এবং গ্রামের খোলা বাতাসে গভীর নিঃশ্বাস লওয়া। আমরাও তাহার ব্যতিক্রম নহি।

যাত্রাবাড়ীস্থ অফিসে কর্মরত আমরা চারজন সহকর্মী-আমি, আব্দুল মু'মিন ভাই, আনোয়ার ভাই এবং মেহেরাজ-সকলেই ঈদের ছুটিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিবার জন্য এমনভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, যেন আমরা কোনো মহাযুদ্ধে যাইতেছি এবং বিজয়লাভ করিয়া ফিরিব।

আমাদিগকের চারজনের তিনটি জেলা-সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, দিনাজপুর-কিন্তু হৃদয়ের টান ছিল এক। আমরা যেন চারটি আলাদা নদী, কিন্তু স্রোত সকলের একই-বাড়ির দিকে। আমার ও আনোয়ার ভাইয়ের গৃহ সিরাজগঞ্জে-যেখানে নদীর পানি যেমন মিষ্টি, মানুষের মনও তেমনই উদার, আব্দুল মু'মিন ভাইয়ের গৃহ গাইবান্ধায়-যেখানে মানুষজনের সরলতা এমন যে, অতিথিকে দেখিলে নিজের শেষ হাঁড়ির ভাতও হাসিমুখে পরিবেশন করিয়া দেয়, আর মেহেরাজের গৃহ দিনাজপুরে-যেখানে লিচুর মৌসুমে গাছের ডাল পর্যন্ত আনন্দে নুইয়া পড়ে।

এই তিনটি জেলার চারটি হৃদয় একত্রিত হইয়া সিদ্ধান্ত লইল-একই রেলগাড়িতে, একই সময়ে, একই আনন্দে গৃহে ফিরিব। সুতরাং একসাথে কমলাপুর রেলস্টেশন হইতে রেলগাড়িতে যাত্রা করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল।

আমাদের দলের মধ্যে আনোয়ার ভাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি সেই মানুষ, যিনি ভবিষ্যতের আশঙ্কাকে আগেভাগেই বন্ধু করিয়া লন। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে আগেভাগেই ছাতা কিনিয়া রাখেন, আর ঝড়ের সংবাদ শুনিলে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দেন। তিনিই অগ্রিম টিকিট কাটিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই একপ্রকার নিশ্চিন্ত মনে আগেই অফিস হইতে রওনা দিয়াছিলেন।

যদ্যপি রেলগাড়ির সময় ছিল বিকাল সোয়া চারটা-একটি সময়, যাহার কথা মনে হইতেই আমাদের বুকের ভিতর অজানা এক দৌড় শুরু হইয়া যাইতেছিল। তথাপি আমরা অবশ্য বেশ নির্ভার ছিলাম। আসলে মানুষের স্বভাবই এই-যতক্ষণ বিপদ চোখে না পড়ে, ততক্ষণ তাহাকে কল্পনা করিতে চায় না।

মনে মনে ভাবিলাম-ঢাকার রাস্তায় যানজট থাকিবে ঠিকই, কিন্তু আমরা তো বীর বাঙ্গালী; যানজটকে পরাজিত করিয়া গন্তব্যে পৌঁছানো আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। তাই খানিকটা বিলম্ব করিয়া রওয়ানা দিলাম বিকাল পৌনে তিনটার দিকে। তখন আমাদের মনে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছিল-যেন আমরা সময়ের চেয়েও দ্রুত চলিতে পারি। সময় আমাদের হাতে যেন বাঁধা একটি ঘড়ি, যাহা আমরা ইচ্ছামতো ঘুরাইতে পারি।

কিন্তু আল্লাহ যে আমাদের জন্য অন্য এক ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তখন কল্পনাও করি নাই। জীবনের পথ কখনো কেবল দূরত্বে মাপা যায় না; কখনো তাহা মাপিতে হয় ভাগ্যের খেয়ালে।

যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা হইতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে একটি রিক্সা পাইলাম। সেই রিক্সাটি দেখিতে একটু পুরাতন হইলেও চালকের চেহারা ছিল অভিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় দৃঢ়। তাহার চেহারায় এক ধরনের স্থিরতা ছিল-যেন তিনি জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটা দেখিয়া এক্ষণে সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে

শিখিয়াছেন। বহু দরকষাকষির পর ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারিত হইল একশত টাকা। অতঃপর আমরা তিনজন এমন আনন্দের সহিত রিক্সায় উঠিলাম, যেন রাজকীয় বাহনে আরোহণ করিতেছি এবং গন্তব্যস্থল আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

কিন্তু মানুষের আশা যত বড় হয়, ভাগ্যের রসিকতাও তত গভীর হয়। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই হঠাৎ করিয়া পথ যেন থমকাইয়া গেল। গোলাপবাগ মাঠের নিকটে পৌঁছাইতেই ঘটিল সেই ঐতিহাসিক বিপর্যয়। সামনে মহাসমুদ্রের ন্যায় এক বিশাল যানজট! গাড়ির সারি এমনভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেন তাহারা সকলেই একযোগে কোনো অদৃশ্য আদেশে স্থির হইয়া গিয়াছে। আমাদের রিক্সা তখন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর আমাদের হৃদয় ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইতে লাগিল।

আমি নীরবে কিছুক্ষণ চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম-এই যানজট যদি আর পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়, তবে রেলগাড়ি ধরিবার স্বপ্নটি কেবলই স্মৃতিতে পরিণত হইবে। মূলত মানুষের মনে যখন উদ্বেগ জন্মে, তখন তাহার বিচারশক্তি প্রায়ই তাড়াহুড়োর হাতে বন্দী হইয়া যায়।

তাই কিছুটা উদ্বিগ্ন হইয়া আব্দুল মু'মিন ভাইকে বলিলাম, "ভাই, দেখিতেছেন তো কী ভয়াবহ জ্যাম! আমার মনে হইতেছে, আমরা যদি এক্ষণেই কোনো পদক্ষেপ না লই, তবে আমাদের সঙ্গে রেলগাড়ির সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমরা বরং রিক্সাওয়ালাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়া নামিয়া পড়ি। হাঁটিয়া গেলেও হয়তো দ্রুত পৌঁছাইতে পারিব।"

আব্দুল মু'মিন ভাই বেশ আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "না না, এত ভীত হওয়ার কিছু নেই। অনেক সময় পথ নিজেই খুলিয়া যায়।"

এই কথাটি শুনিয়া আমার মনে একটুখানি দ্বিধা জন্মাইল, কিন্তু তাড়াহুড়োর প্রবৃত্তি সেই দ্বিধাকে দ্রুত সরাইয়া দিলো। তাই আমি জোর করিয়াই রিক্সাওয়ালাকে বলিলাম, "মুরুব্বী, আমাদের নামাইয়া দেন। আমরা হাঁটিয়া যাইব।"

তিনি তখন অভিজ্ঞ দার্শনিকের ন্যায় শান্ত স্বরে বলিলেন, "একটু পরেই যানজট ছাড়িয়া দিবে। ধৈর্য ধরিয়া থাকেন।"

তাহার কণ্ঠে ছিল অভিজ্ঞতার দৃঢ়তা; কিন্তু আমার মনে তখন ছিল অস্থিরতার তাড়না। তাই আমি তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পঞ্চাশ টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "কিছু মনে করিবেন না মুরুব্বী, ঈদের সময় ট্রেন মিস করিলে বড় বিপদ হইবে।"

অবশেষে আমরা জোর করিয়াই রিক্সা হইতে অবতরণ করিলাম।

কিন্তু হায়! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! জীবনের খেলায় এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যাহা মানুষকে নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি হালকা হাসি হাসিতে বাধ্য করে। আমরা নামিবামাত্র অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ভয়াবহ যানজট এমনভাবে সরিয়া গেল, যেন কোনো অদৃশ্য পরিচালক মঞ্চের পর্দা সরাইয়া দিয়াছেন। পথ আবার চলমান হইল, আমাদের বাহনটিও ধীর গতিতে সামনে অগ্রসর হইতে লাগিল-যেন সে আমাদের দিকে তাকাইয়া নীরবে বিদায় জানাইতেছে।

এইবার তাহারা দুইজন আমার দিকে তাকাইল। সেই দৃষ্টিতে অভিযোগের চেয়ে বিস্ময়ই বেশি ছিল। মেহেরাজ বলিল, "দেখিলেন তো? এখন কী করিবেন?"

তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাব দিলো, "এক কাজ করি, আবার মুরুব্বীর নিকট যাই।"

আমি পরিস্থিতি কিছুটা আন্দাজ করিয়া বলিলাম, "মুরুব্বীর নিকট এখন যাওয়া ঠিক হইবে না। বেচারা নিশ্চয়ই রাগ করিয়া আছে। এখন গেলে হয়তো তিনি আমাদের প্রতি এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, যাহা শত্রুও সহ্য করিতে পারিবে না।"

কিন্তু আমার কথা কে শুনে? আব্দুল মু'মিন ভাই তাহার কথায় সায় দিয়া দুইজন আবার সেই মুরুব্বীর নিকট গমন করিল।

এইবার তিনি তাহাদের অস্থিরতার রহস্য বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি রাগান্বিত ভঙ্গিতে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বলিলেন, "এক্ষণে আর যাইব না। যদি যাইতে হয়, তবে আশি টাকা দিতে হইবে।"

তাহার এই কথায় আমরা এক মুহূর্তে বুঝিয়া গেলাম-মানুষের ধৈর্য্যেরও একটি মূল্য আছে, আর সেই মূল্য অগ্রাহ্য করিলে কখনো কখনো তাহার মূল্য দ্বিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসে।

المعرفة من خلال القصص / গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান:

জবাব

সুপ্ত রায়হান সজিব*

[প্রথম পর্ব]

সারাদিনের ক্লান্তি শেষে বিছানায় শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে আসন্ন দিবসের কর্মসূচি নিয়ে মনের খেরোখাতায় আঁকিবুকি করছি।*

শান্তিতে একটু ঘুমোবো তার ফুরসতও মেলে না।

চিকিৎসকদের অভিধানে ঘুম শব্দের অর্থ একটু ভিন্নমাত্রায় প্রকাশিত।

কারণ, আমাদের মস্তিষ্ককে সর্বদা সচল রাখতে হয়।

তাইতো, প্রতিরাতে ঘুমের ভেতরেও স্বপ্নে আট-দশটা অস্ত্রোপচার করি।

আঁকিবুঁকি করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

হঠাৎ, ফোনের ভাইব্রেশনে ঘুম ভাঙলো।

স্ক্রিনে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলাম।

স্বয়ং বিভাগীয় সদর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ স্যার কল দিয়েছেন।

কনটাক্ট নাম্বার আদান প্রদানের পর মুঠোফোনে কোনোদিন কথা হয়নি স্যারের সাথে।

মধ্যরাতে তলব করেছেন এই অধমকে,

নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার।

তড়িঘড়ি করে ফোন পিক করলাম।

কুশল বিনিময়ের পর তিনি শুধু একটি কথাই বললেন: "অতি দ্রুত ইউনিয়ন পরিষদে চলে আসো। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।"

আমার কর্মস্থল টেকনাফ উপজেলা সদর হাসপাতালে।

এখান থেকে ইউনিয়ন পরিষদ ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ি বন্ধুর রাস্তা পেরিয়ে অতি দ্রুত পৌঁছে গেলাম।

বাইক থাকায় এই ফযীলত।

ইউনিয়ন পরিষদের মূল ফটকের সামনে জনসাধারণের প্রচুর ভিড়।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করলাম কারো লাশ হয়তো ময়না তদন্ত করতে হবে।

কারণ, এই পাহাড়ি এলাকায় গুম-খুন নিত্যকার ব্যাপার।

উপজাতি ও বাঙালি একে অপরকে এক চুল ছাড় দেয় না।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম।

ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দায় গাদাগাদি করে অনেক লোক শুয়ে-বসে আছে।

আবছা আলোয় ছায়ামূর্তিগুলো অস্পষ্ট,

তবে বোঝা যাচ্ছে এদের বেশিরভাগই নারী।

পরিস্থিতি কিছুই আঁচ করতে পারলাম না।

মনটা কৌতূহলী হয়ে ওঠলো।

অতি দ্রুত চেয়ারম্যান সাহেবের কামরায় প্রবেশ করলাম।

অধ্যক্ষ স্যারকে ঘিরে অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বসে আছেন।

ভেতরে প্রবেশ করতেই সবার দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ হলো।

কুশল বিনিময় করার পর স্যার আমাকে তলব করার কারণ বর্ণনা করলেন।

যার সারাংশ হলো– "এই ইউনিয়ন মায়ানমারের সাথে সীমান্তবর্তী। এর পূর্ব সীমানা ঘেঁষে নাফ নদ প্রবাহিত।

মূলত এটি কোনো নদ নয়, বঙ্গোপসাগরের বর্ধিত অংশ।

সরু ও ছোট বিধায় একে নদ হিসেবে ডাকা হয়।

এর পশ্চিম পাড়ে বাংলাদেশের টেকনাফ উপজেলা এবং পূর্ব পাড়ে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সীমানা।

যার পূর্ব নাম ছিল আরাকান।

সমস্যার সৃষ্টি এই রাখাইন হতেই।

অদ্য রাত ২:০০ টার দিকে বাঁশঘাটা পয়েন্টে শত শত নৌকার অনুপ্রবেশ ঘটে।

বিজিবি ও কোস্টগার্ডের সদস্যরা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুত্তরে যা শুনতে পায় তা হলো– আগত লোকগুলো জাতিতে রোহিঙ্গা। কয়েকদিন আগে মংডুতে শুরু হওয়া মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান আজ রাতে গণহত্যায় রূপ নিয়েছে। *[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]*

---

* *সদস্য, মাদারগঞ্জ উপজেলা শুব্বান*

قصيدة / কবিতা

সংস্কারের প্রতিজ্ঞা

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন★

যেখানে ইসলামের নামে চলে অপসংস্কৃতি,
সেখানে থাকতে আমিও জানাই অস্বীকৃতি।
যেখানে ইসলাম ধর্মকে করা হয়েছে বিকৃতি,
সেখানে আমি ফিরেয়ে আনি তাঁর আকৃতি।
যেখানে হালাল-হারাম না বুঝে চলছে পুঁজিবাদীর সন্ধান,
সেখানে করবো আমি হালালের উত্থান।
যেখানে জিহাদের নামে গড়ে ওঠে জঙ্গি,
সেখানে গড়বো আমি সঠিক দা'ওয়াত ও জিহাদী সঙ্গী।
যেখানে সভ্যতার নামে গড়ে ওঠে জাহিলিয়াতের নমস্কার,
সেখান থেকে দূর করবো আমি বেড়াজালের কুসংস্কার।
যেখানে সুন্নাহর নামে গর্জে ওঠে বিদআতের ধুম্রজাল,
সেখানে গড়ে ওঠাবো আমি সুন্নাতের দ্বীপ্ত মশাল।
যেখানে হেদায়েতের নামে চলে ভ্রান্তির ডাক,
সেখানে করবো আমি ভ্রষ্টাকে পাক।

তাওহীদবাদের সংগ্রাম

নাদিম বিন আবুল কালাম★

পৃথিবীর অন্ধকার যতই ঘন হোক,
অজ্ঞানতা ও বিদ্রোহে ঢেকে যাক লোক,
তাওহীদবাদীরা এগিয়ে চলে অটল মনে,
সত্যের দীপ জ্বালিয়ে, অন্ধকার ভাঙে তারা বনে।
বিভ্রান্তি যতই ছড়াক চারদিকে,
প্রাণে ধারণ করে তারা আলোর দিক নির্দেশিকা।
শিকল ভেঙে, cadenas ছিন্ন করে,
সত্যের পথে এগিয়ে চলে তারা নির্ভয়ে।
শাস্ত্র, ইতিহাস, দলিল হাতে নিয়ে,
অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তারা নিরন্তর।
ভুলের রাজত্ব আর কখনো টিকে না,
সত্যের পতাকা উঁচু হয় হৃদয়ে জ্বলে।
প্রাণের স্বরে গাইবে প্রতিটি আশা,
আল্লাহর পথে থাকবে অবিচল দৃঢ়তা।
তাওহীদীবাদীদের সংগ্রাম অম্লান,
তাওহীদীবাদ জিন্দাবাদ!

★ মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

★ মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

দুঃখ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

দুঃখ যদি কেনাবেচা হতো
তবে আমার অভাব থাকে অতো?
কতো টাকা পেতাম- আয়েশ করে খেতাম!
বুক পেতে সদা খুশি মনে
খুঁজে নিতাম দুঃখ জনে জনে
করে দুখের চাষ, বেচতাম বারো মাস-
কতো রকম দুঃখ জমা বুকে
বলার ভাষা নেই তো আমার মুখে
লিখলে কালি শেষ, কমবে নাতো লেশ।
কালো দুঃখ সাদা দুঃখ আর
কতো রঙ-বেরঙের দুঃখ আমার
হাজার শত শত, তারা আছে যত-
পাশে থাকা দূরে রাখা ঢের
স্বপ্ন ভাঙা শত অপূরণের
হরেক দুখের মেলা, করে নিত্য খেলা!
দুখের সনে সারাক্ষণে থাকি
সুখ তো আমায় দিয়ে যাচ্ছে ফাঁকি।

মানুষ কোথায় যায় রে!

মজিব আলমাওড়ী

যুক্তরাষ্ট্র দেখিয়ে দিয়েছ
কত বড় সে শক্তিধর।
ভেনেজুয়েলার বোমবিংটার
ইরানের দেশে খবর কর।

চিনরাশিয়ায় পড়বে বোমা
মধ্যপ্রাচ্য সবুর কর।
চিনকে ঠেকাতে পায় না ভারত
তাই তো করছে এত ধরফর!

মাদুরো হারেনি হেরেছে বিশ্ব
মানবতাবাদী চুপসে নিশ্ব

জাতিসংঘ চুপচাপ বসে
দুঃখ ছাড়া সে করবে কী?
হাঙ্গর যদি সন্ত্রাসী হয়
শেকল পরিয়ে ধরবে কী?

বিশ্বমোড়ল কিলায় বিশ্ব
অন্য মোড়ল নাই রে!
পরমানু নিয়ে খলছে খেলা
মানুষ কোথায় যায় রে!

★ সাবেক অধ্যক্ষ, শাহ্ সুলতান (রহিমাহুল্লাহ) কামিল মাদ্‌রাসা গোদাগাড়ী। বর্তমান অধ্যক্ষ, দেবীপুর রহমানিয়া মাদ্‌রাসা, তানোর, রাজশাহী।

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড রাজশাহী জোনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আজ ২ মে-২০২৬ শনিবার রাজশাহী কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর আয়োজনে রাজশাহী জোনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকে নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর রেজিস্ট্রার ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জোনের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর সচিব শাইখ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মাদানী।

সাঘাটায় জমঈয়তে আহলে হাদীসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, জুমারবাড়ী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২২ এপ্রিল-২০২৬) সকাল ৯টায় জুমারবাড়ি দারুল হাদীস মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ মাসউদুর রহমান মাদানী। এতে সাঘাটা থানার প্রায় ৮০টি মসজিদের ইমাম, খতিব, সভাপতি ও সেক্রেটারিসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবরাহিম বিন আব্দুল হালিম মাদানী। এছাড়া গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের সভাপতি, সেক্রেটারিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা, দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সংগঠনের কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং দ্বীনের দা'ওয়াত সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। সভাটি সাঘাটা উপজেলার দায়িত্বশীলদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং উপস্থিতিদের মাঝে নতুন উদ্যম ও প্রেরণা সঞ্চার করে। সুশৃঙ্খল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা সভাটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

নীলফামারীতে জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত

নীলফামারী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাউন্সিল অধিবেশন ২৫ এপ্রিল শনিবার জলঢাকার মসজিদ ওসমান বিন-আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ মো. আব্দুর রউফ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী এবং সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি (রাজশাহী-রংপুর) শাইখ আবু রায়হান সিদ্দিকী।

এছাড়াও নীলফামারী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সিল অধিবেশনে ২০২৬-২০২৯ মেয়াদের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এতে অধ্যক্ষ মো. আব্দুর রউফকে সভাপতি এবং মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিমকে সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়। একই সঙ্গে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

সভায় সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করা এবং দা'ওয়াতি কাজ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

গাজীপুর মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত

গাজীপুর মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাউন্সিল অধিবেশন গত ২৫ এপ্রিল শনিবার জামি'আ দারুল হাদীস আল-আরাবিয়া, কামারজুরী, বোর্ড বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হুসাইন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী এবং যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ।

অনুষ্ঠানে গাজীপুর মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, গাজীপুর মহানগরের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সিল অধিবেশনে ২০২৬-২০২৯ সেশনের জন্য শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হুসাইনকে সভাপতি এবং জনাব সিরাজুল ইসলামকে সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

বেরাইদে জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত

রাজধানীর বেরাইদ এলাকায় আগার ও চটকিপাড়া জামে মসজিদে জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (২৫ এপ্রিল ২০২৬) এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা তুহিরুল ইসলাম তুহিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল ও ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের সভাপতি শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন এবং জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী। সভায় বক্তারা সংগঠনের কার্যক্রম আরো বেগবান করা, দাওয়াহ কার্যক্রম জোরদার এবং স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বেরাইদ এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মো. শোয়েব ইসলামের সভাপতিত্বে এবং শরীফ মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ এপ্রিল সোমবার এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়াহ মসজিদে বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুলিয়াদি জামিয়াতুল ফুরকান আস সালাফিয়াহ কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার আহসান আব্দুর রব। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন বোর্ডের রেজিস্ট্রার ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হুসাইন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ নুরুল আলম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, বোর্ডের পরিদর্শক শাইখ মাসুদুল আলম উমরী এবং প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী।

সভায় নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বোর্ডের সচিব শাইখ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মাদানী।

সভায় শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন, সমন্বয় বৃদ্ধি এবং দ্বীনী শিক্ষার প্রসারে করণীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ এপ্রিল শুক্রবার, বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের এক সাংগঠনিক সভা বাদ জুমু'আহ্ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শেখ আশরাফ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাইখ নাজমুল হক মাদানী (খতিব, আব্দুল গনি জামে মসজিদ, পাহাড়তলী, কক্সবাজার); শাইখ মুজিবুর রহমান মাদানী (দাঈ', সৌদি রাজকীয় দূতাবাস বাংলাদেশ ও প্রভাষক, ইসলামিয়া মহিলা কামিল মাদ্‌রাসা, কক্সবাজার); শাইখ মুস্তাক আহমদ মাদানী (দাঈ', সৌদি রাজকীয় দূতাবাস বাংলাদেশ এবং শাইখ ইয়াহিয়া বিন আবু সামা, বিভাগীয় প্রধান, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামিয়া মহিলা কামিল [মাস্টার্স] মাদ্‌রাসা, কক্সবাজার)। এছাড়া সভায় সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

التوعية الصحية / স্বাস্থ্য সচেতনতা

সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে কর্মঘণ্টা বেড়েছে, শারীরিক পরিশ্রম কমেছে এবং খাদ্যাভ্যাসে দ্রুত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রভাব বেড়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, এই পরিবর্তিত জীবনধারা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাবে বর্তমানে অসংক্রামক রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতির চিত্র: চিকিৎসকদের তথ্যমতে, বর্তমানে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্থূলতা ও কিডনি রোগের মতো অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত চিনি ও চর্বি গ্রহণ এবং আঁশযুক্ত খাবারের অভাব। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে জাঙ্কফুড ও কোমল পানীয়ের প্রতি আকর্ষণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত: পুষ্টিবিদ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, মানবদেহের দৈনন্দিন কার্যক্রম সচল রাখতে সুষম খাদ্য অপরিহার্য। তারা বলেন, ⇨ শর্করা শরীরের প্রধান শক্তির উৎস, ⇨ প্রোটিন কোষ গঠন ও ক্ষয়পূরণে সহায়তা করে, ⇨ স্বাস্থ্যকর চর্বি হরমোন নিঃসরণ ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয়, ⇨ ভিটামিন ও খনিজ লবণ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ⇨ খাদ্যআঁশ হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উপাদানগুলোর ঘাটতি দীর্ঘদিন চললে শরীরে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়।

সঠিক খাদ্যাভ্যাসের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব: গবেষণা ও চিকিৎসা অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, সঠিক খাদ্যাভ্যাস– ⇨ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, ⇨ কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে, ⇨ শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ⇨ মানসিক চাপ ও অবসাদ কমাতে ভূমিকা রাখে, ⇨ দীর্ঘায়ু ও কর্মক্ষম জীবন নিশ্চিত করে।

বিশেষ করে কোভিড-পরবর্তী সময়ে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব আরো বেশি বেড়েছে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আধুনিক খাদ্যাভ্যাস: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান সময়ে খাদ্যাভ্যাস হওয়া উচিত– **১.** প্রতিদিন কমপক্ষে বিভিন্ন রঙের শাকসবজি ও মৌসুমি ফল অন্তর্ভুক্ত করা, **২.** পরিমিত ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল, মাছ, ডিম, দুধ ও চর্বিহীন মাংস গ্রহণ, **৩.** অতিরিক্ত লবণ উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায় –এ বিষয়ে সচেতন থাকা, **৪.** পরিশোধিত চিনি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার সীমিত করা, **৫.** ফাস্টফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের পরিবর্তে ঘরে তৈরি খাবার খাওয়া, **৬.** পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করে শরীরের পানিশূন্যতা রোধ করা, **৭.** নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী খাবার গ্রহণ ও রাতের খাবার হালকা রাখা।

সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা: চিকিৎসকদের মতে, সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার থেকেই শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। একই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

উপসংহার: বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুস্থ জাতি গঠনের জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস একটি অপরিহার্য শর্ত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তথ্য ও পরামর্শ অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসম্মত ও সুষম খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করলে অধিকাংশ জীবনধারাজনিত রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাই ব্যক্তিগত সচেতনতা, পারিবারিক উদ্যোগ ও সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলাই হতে পারে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের মূল চাবিকাঠি।

ঔষধি গাছ ও তার উপকারিতা: একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন

ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এ দেশের উর্বর মাটি ও অনুকূল জলবায়ুর কারণে অসংখ্য ঔষধি গাছ জন্মায়। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রাকৃতিক ভেষজ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে আসছে। আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতিতে ঔষধি গাছের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানও বর্তমানে এসব ভেষজ উদ্ভিদের কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের গুণাগুণ প্রমাণিত হয়েছে। এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বহুল পরিচিত ও কার্যকর ১০টি

ঔষধি গাছের পরিচয়, ব্যবহার, সেবন বিধি এবং উপকারিতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. নিমঃ বৈজ্ঞানিক নাম Azadirachta indica। **উপকারিতা–** ⇨ ত্বকের রোগ যেমন একজিমা, খোসপাঁচড়া ও ব্রণ নিরাময়ে কার্যকর, ⇨ রক্ত পরিশোধন করে শরীরকে বিষমুক্ত রাখতে সাহায্য করে, ⇨ দাঁত ও মাড়ির রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ পাতার রস বা নিমপাতার কষামুক্ত রস দিনে ১-২ চামচ খেতে পারেন, ⇨ ত্বকে পেস্ট করে লাগালে ব্রণ ও চুলকানি কমায়, ⇨ দাঁতের জন্য নিমের ডাঁটা নিয়মিত ব্যবহারে উপকারী।

২. তুলসিঃ বৈজ্ঞানিক নাম Ocimum sanctum। **উপকারিতা–** ⇨ সর্দি, কাশি ও ভাইরাস জ্বরে উপকারী, ⇨ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ⇨ মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করে। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ তাজা পাতা চিবিয়ে খাওয়া বা গরম পানিতে তুলসির পাতা ফুটিয়ে চা হিসেবে পান করতে পারেন, ⇨ দিনে ৫-৬ পাতা নিয়মিত খেলে সর্দি-কাশি প্রতিরোধ হয়।

৩. বাসকঃ বৈজ্ঞানিক নাম Justicia adhatoda। **উপকারিতা–** ⇨ কাশি, হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসে উপকারী, ⇨ কফ তরল করে বের হতে সাহায্য করে, ⇨ শ্বাসনালীর প্রদাহ কমায়। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ পাতার রস বা কষা দিনে ১ চা চামচ খেতে পারেন, ⇨ কফ ও কাশি হলে গরম জল বা চায়ের সঙ্গে মিলিয়ে পান করা যায়।

৪. আমলকিঃ বৈজ্ঞানিক নাম Phyllanthus emblica। **উপকারিতা–** ⇨ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ⇨ হজম শক্তি উন্নত করে, ⇨ চুল পড়া রোধ ও চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ প্রতিদিন সকালে ১-২টি তাজা আমলকি খাওয়া বা শুকনো আমলকির গুঁড়ো দুধের সঙ্গে খাওয়া যায়, ⇨ জুস বা চা হিসেবে ব্যবহার করলে ভিটামিন C সরবরাহ হয়।

৫. হলুদঃ বৈজ্ঞানিক নাম Curcuma longa। **উপকারিতা–** ⇨ প্রদাহ, ব্যথা ও ফোলা কমায়, ⇨ ক্ষত দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে, ⇨ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ রান্নায় সুষম পরিমাণে হলুদ ব্যবহার করতে পারেন, ⇨ ক্ষত বা পোড়ায় হলুদের পেস্ট লাগানো যায়, ⇨ গরম দুধে ১ চামচ হলুদ মিশিয়ে খাওয়া উপকারী।

৬. ঘৃতকুমারী (অ্যালোভেরা)ঃ বৈজ্ঞানিক নাম Aloe vera। **উপকারিতা–** ⇨ ত্বকের পোড়া, ক্ষত ও ব্রণ নিরাময়ে কার্যকর, ⇨ হজম সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, ⇨ চুলের গোড়া মজবুত করে। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ পাতার জেল সরাসরি ত্বকে লাগাতে পারেন, ⇨ হজম সমস্যা হলে ১ চা চামচ অ্যালোভেরা জেল দিনে ১-২ বার খাওয়া যায়, ⇨ চুলে লাগালে শুষ্কতা কমে ও চুল মজবুত হয়।

৭. কালমেঘঃ বৈজ্ঞানিক নাম Andrographis paniculata। **উপকারিতা–** ⇨ জ্বর ও সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক, ⇨ লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করে, ⇨ রক্ত পরিশোধনে সহায়তা করে। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ কালমেঘের কষা বা রস দিনে ১ চা চামচ খাওয়া যেতে পারে, ⇨ তেল বা পেস্ট করে ক্ষত বা প্রদাহে ত্বকে লাগানো যায়।

৮. থানকুনিঃ বৈজ্ঞানিক নাম Centella asiatica। **উপকারিতা–** ⇨ স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধি করে, ⇨ হজম সমস্যা দূর করে, ⇨ ক্ষত দ্রুত সারাতে সহায়ক। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ তাজা পাতা স্যালাডে খেতে পারেন, ⇨ পাতার রস বা কষা দিনে ১ চা চামচ খাওয়া যেতে পারে, ⇨ ক্ষত বা ফোলা জায়গায় পেস্ট ব্যবহার করা যায়।

৯. অর্জুনঃ বৈজ্ঞানিক নাম Terminalia arjuna। **উপকারিতা–** ⇨ হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করে, ⇨ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, ⇨ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ অর্জুনের ছাল কষা বা চা হিসেবে দিনে ১-২ বার পান করা যেতে পারে, ⇨ হার্ট সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত ব্যবহার উপকারী।

১০. আদাঃ বৈজ্ঞানিক নাম Zingiber officinale। **উপকারিতা–** ⇨ হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, ⇨ বমি, গ্যাস ও বদহজম দূর করে, ⇨ সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথায় উপকারী। **সেবন ও ব্যবহার–** ⇨ তাজা আদা চা বা গরম পানিতে কুচি করে খাওয়া যায়, ⇨ খাবারের সঙ্গে সামান্য আদার গুঁড়ো মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়, ⇨ প্রতিদিন ১-২ চা চামচ আদা খেলে হজম ও ঠাণ্ডা সমস্যায় উপকার হয়।

উপসংহারঃ এই প্রতিবেদনে আলোচিত ঔষধি গাছগুলো আমাদের প্রাকৃতিক চিকিৎসা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব উদ্ভিদ সহজলভ্য, স্বল্প ব্যয়বহুল এবং তুলনামূলকভাবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত। সঠিক সেবন বিধি মেনে ব্যবহার করলে স্বাস্থ্য রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর। তাই ঔষধি গাছ সংরক্ষণ, চাষাবাদ ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এসব প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): ***কোনো এক আলেম বলেছেন, মৃত্যু যেভাবে মানুষকে তালাশ করে ঠিক রিয্কও সেভাবে মানুষকে তালাশ করে, আবার কোনো এক আলেম বলেছেন, তুমি কর্ম করো বা না করো তোমার রিয্কে যেটা আছে ওটা তুমি পাবেই বিষয়টি কতখানি সত্য?***

শাহরান রহমান, গুলশান।

জবাব: "মৃত্যু যেভাবে মানুষকে তালাশ করে ঠিক রিয্কও সেভাবে মানুষকে তালাশ করে" –এটা রাসূল (ﷺ)-এর কথা। *(সহীহ: আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী- হা. ২৬৭১; শু'আবুল ঈমান- হা. ১১৯১; মুসনাদে বাযযার- হা. ৪০৯৯; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ১৭০৩; মিশকাত- হা. ৫৩১২)*

পক্ষান্তরে যে আলেম বলেছেন, "তুমি কর্ম করো বা না করো তোমার রিয্কে যেটা আছে ওটা তুমি পাবেই"। যদি তিনি কর্ম বাদ দিয়ে শুধু তাকদিরের উপর ভরসা করে থাকাকে উদ্দেশ্য নেন তাহলে তা ভুল। কেননা আল্লাহ ও রাসূল কাজ করতে বলেছেন, শুধু তাকদিরের উপর ভরসা করে বসে থাকতে বলেননি। *(সূরা আল-জুমু'আহ: ১০; সূরা আল-মুল্ক: ১৫; ইবনু মাজাহ্- ২১৪৪; বায়হাক্বি- ৩৫৪৭৩, সহীহ)*

আর যদি তাকদিরের উপর ঈমানের গুরুত্ব বুঝাতে উক্ত কথা বলে থাকেন তাহলে ঠিক বলেছেন। *(বুখারী- ৩৩৩২)*

তবে আপনার বসে থাকাটা যদি দ্বীনের দা'ওয়াতের জন্য হয় তাহলে আল্লাহ আপনার জীবিকার ব্যবস্থা করবেন। *(সূরা আ-লি-'ইমরান: ৩৭; সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯৮৯)*

কাজ বর্জন করে শুধু তাকদিরের উপর ভরসা করে বসে থাকা নিন্দনীয়। *(শারহুল 'আক্বিদাহ্ আত্ ত্বহাবীয়াহ- ২১৪ পৃ., দারু ইবনীল জাওজী প্রকাশনী)*

জিজ্ঞাসা (০২): ***মানুষের মূর্তি ও মানুষের ছবি দেয়ালে টাঙানো যাবে না কিন্তু কোনো প্রাণী যেগুলো আগে জীবিত ছিল এখন মৃত সেইগুলোর স্ট্যাচু কি ঘরে রাখা যাবে, যেমন- হরিণের মাথা।*** *নাফিজ আহমেদ, খিলক্ষেত, ঢাকা।*

জবাব: যাবে না। কেননা ছবি, মূর্তি, স্ট্যাচু (Statue) বা ভাস্কর্য সবাই হারাম। এগুলো তৈরি করা হারাম এবং বড় পাপ। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২২৫)*

যে ঘরে এগুলো থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশ্তা প্রবেশ করে না। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৪৯)*

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অনেকে ছবি, মূর্তিকে হারাম মনে করলেও স্ট্যাচু বা ভাস্কর্যকে বৈধ মনে করেন যা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা স্ট্যাচু বা ভাস্কর্যকে আরবীতে তিমসাল বলা হয় যা নিম্নোক্তসহ অনেক হাদীসে হারাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِيْ دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِيْ صُفَّتِهِ تَمَاثِيْلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ".

মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) মাসরূকের সাথে ইয়াসার ইবনু নুমাইরের ঘরে ছিলাম। মাসরূক ইয়াসারের ঘরের আঙিনায় কতগুলো মূর্তি দেখতে পেয়ে বললেন: আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছি এবং তিনি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সব থেকে শক্ত শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি তৈরি করে। *(বুখারী- ৫৯৫০)*

জিজ্ঞাসা (০৩): ***আমি একটা চাষীকে টাকা দিলাম চাষ করার জন্য ফসল ওঠার পরে বাজারে যে দাম থাকে সেই দাম থেকে ২০০ টাকা কম করে আমাকে দেওয়ার কথা বললাম এটা কি বৈধ হবে?*** *ইকরামুল ইসলাম গাজীপুর, ঢাকা।*

জবাব: এটা বৈধ হবে না। কেননা এটা সুদ। শরিয়তে মূলনীতি হচ্ছে, প্রত্যেক ধার বা ঋণ যা উপকার নিয়ে আসে তা সুদ ও হারাম। তবে আপনি এটাকে সালাম ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে করলে বৈধ হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২৩৯)*

সালাম ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু মূলনীতি আছে। যেমন- পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে, পণ্যের গুণ নির্ধারণ করতে হবে, নির্ধারিত সময় উল্লেখ করতে হবে, উক্ত সময় পন্যটা পাওয়া সম্ভব হতে হবে। *(আল মুগনী- মাসয়ালা নং- ৩১৯৫)*

জিজ্ঞাসা (০৪): ***একজন মহিলার চার সন্তান, মহিলা জীবিত থাকা অবস্থায় তিন সন্তান মারা যায়, ওই মহিলার স্বামীর সম্পত্তি থেকে কতটুকু পাবে এবং ওই মহিলার সম্পদগুলো মহিলা মারা যাওয়ার পরে কে পাবে?***

মো. ফখরুল, ফেনী।

জবাব: স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে এক চতুর্থাংশ পাবে যদি স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি সন্তান থাকে তাহলে এক অষ্টমাংশ পাবে। *(সূরা আন্-নিসা: ১২)*

তাহলে উক্ত মহিলা স্বামী থেকে এক অষ্টমাংশ তথা আট ভাগের এক ভাগ সম্পদ পাবে। মহিলা মারা যাওয়ার পর উক্ত মহিলার ওয়ারিশগণ তার রেখে যাওয়া সম্পদের ভাগ পাবেন। তার ওয়ারিশ হবেন: সন্তান, পিতা-মাতা, স্বামী।

তাহলে উক্ত মহিলা মারা যাওয়ার পর তার জীবিত সন্তানসহ পিতা-মাতা জীবিত থাকলে, তার স্বামী বেঁচে থাকলে সেও মিরাশ পাবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(ফিকহুস্ সুন্নাহ- ৩/৬১২)*

জিজ্ঞাসা (০৫): ***আহাদ অর্থ কী এবং ওয়াহেদ অর্থ কী? সেই সাথে সূরা আল-ইখলাসের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা কী?*** *মো. সাঈদ, দলকা, লক্ষীপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলা।*

জবাব: আহাদ ও ওয়াহেদ উভয়টি অর্থ 'এক' এবং উভয়টাই আল্লাহর নাম। *(সূরা আল-ইখলা-স: ১; সূরা ইউসুফ: ৩৯)* তবে আরবী ভাষায় শব্দ দু'টির ব্যবহার ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।

"'ওয়াহিদ' (واحد) এবং 'আহাদ' (أحد)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো– 'আহাদ' এমন একটি শব্দ, যা সাধারণত সংখ্যা-সম্পর্কিত যে কোনো সঙ্গী বা অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- বলা হয়: 'আমার কাছে একজনও আসেনি' (ما جاءني أحد)। আর 'ওয়াহিদ' হলো এমন একটি নাম, যা সংখ্যা গণনার সূচনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন- বলা হয়: 'মানুষদের মধ্যে একজন আমার কাছে এসেছে' (جاءني واحد من الناس)। কিন্তু এখানে 'আহাদ' ব্যবহার করা হয় না। অতএব, 'ওয়াহিদ' সত্তাগতভাবে একক, তার কোনো সমকক্ষ বা অনুরূপ নেই। আর 'আহাদ' অর্থগতভাবে একক অর্থাৎ- তার সাথে কোনো অংশীদারিত্ব বা শরীকির ধারণাই নেই। আরও বলা হয়েছে– 'ওয়াহিদ' হলো সেই সত্তা, যিনি অবিভাজ্য, যাকে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না, যিনি বিভাজন গ্রহণ করেন না, যার কোনো সমতুল্য বা অনুরূপ নেই। আর এই দুই গুণ (সত্তাগত এককত্ব ও অর্থগত এককত্ব) একত্রে কেবল আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" ***(আন নিহায়াহ ফি গরিবিল হাদীস ওয়াল আসার- বিখ্যাত ভাষাবিদ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল আসীর আল-জাযারী (রাহিমাহুল্লাহ), অধ্যায়: وحد, ৫/১৫৯)***

তাফসীর ইবনু কাসীরে তিনি উল্লেখ করেন, ইকরিমা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যখন ইহুদিরা বলল, "আমরা মহান আল্লাহর পুত্র উযাইরকে উপাসনা করি", নাসারারা বলল, "আমরা মহান আল্লাহর পুত্র মসীহকে উপাসনা করি", মাজুসরা বলল, "আমরা সূর্য ও চাঁদকে উপাসনা করি", আর মুশরিকরা বলল, "আমরা মূর্তিগুলোর উপাসনা করি", তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ওপর নাযিল করলেন: "বলুন, তিনি আল্লাহ, একক" (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)।

অর্থাৎ- তিনি সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলা যাঁর কোনো তুলনা নেই, কোনো সহকারী নেই, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কোনো সদৃশ নেই, কোনো সমকক্ষ নেই।

'আহাদ' শব্দটি ইতিবাচক বুঝতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না; কারণ তিনি তাঁর সকল গুণাবলী ও কর্মে পরিপূর্ণ ও পরিপূর্ণতম।" ***(তাফসীর ইবনু কাসীর- সূরা আল-ইখলাসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)***

জিজ্ঞাসা (০৬): ***আমার চাচাতো বোন পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। চার বছর সংসার করে তার বাবা মা বিয়ে মেনে নেয়নি। পরে মেয়েটা তার বাবার কথায় ছেলেটাকে ত্বালা-ক্ব দেয়। বিশ দিন পর বাবার ইচ্ছায় অন্য জায়গায় তার বিয়ে হয়। এখন ইদ্দত পালন না করায় বিয়ে বৈধ হয়েছে কি? বৈধ না হলে করণীয় কি? এখনকি তার যিনা হচ্ছে?***

মো. মামুনুর রশিদ, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

জবাব: অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করায় প্রথম বিয়ে বাতিল। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ২০৮৩, সহীহ)*** তাই এরূপ বিয়েতে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করা আবশ্যক।

"ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো অজানা (অর্থাৎ- যিনি তার স্বামী নন) পুরুষের জন্য ইদ্দত পালনরত নারীর সাথে বিবাহ করা জায়িয নয়– ইদ্দত যেকোনো ধরনেরই হোক না কেন; তা ত্বালা-ক্ব, মৃত্যু, ফাসখ (বিবাহ বাতিল) বা সন্দেহজনিত সম্পর্কের কারণেই হোক এবং ত্বালা-ক্বটি রজঈ হোক বা বায়েন (ছোট বা বড়)–সব ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য। এর কারণ হলো– বংশধারা সংরক্ষণ করা, তা যেন মিশ্রিত না হয় এবং পূর্ববর্তী স্বামীর অধিকার সংরক্ষণ করা। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি ইদ্দত অবস্থায় থাকা নারীর সাথে বিবাহ চুক্তি করে, তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ- সেই বিবাহ বাতিল করা হবে)।" ***(আল মাওসুয়া আল ফিকহিয়াহ- ২৯/৩৪৬)***

উক্ত বিচ্ছেদের পর মহিলাকে এক হায়িয ইদ্দত পালন করতে হবে জরায়ু পরিস্কার করার জন্য। আপনার চাচাতো বোনের বিয়ে বিচ্ছেদের এক হায়িয পর যদি ২য় বিয়ে হয়ে থাকে তাহলে সমস্যা নেই, উক্ত বিয়ে বিশুদ্ধ হবে ইন্ শা-আল্লাহ। আর যদি এক হায়িয অতিবাহিত হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায় তাহলে বিবাহ বাতিল হবে। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩৫)*

এখন করণীয় হচ্ছে, আগে প্রথম স্বামীর বা বিয়ের এক হায়েজ ইদ্দত পালন করে পরে ২য় স্বামীর সাথে আবার নতুন করে বিয়ে দিতে হবে। ***(মুখালাফাতুন তাকাউ ফীহা বা'যুন নিসা- লেখক: মুহাম্মাদ হাসান আব্দুল গাফ্ফার- ৩/৮)***

প্রখ্যাত ফকীহ ইবনু কুদামাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: "যদি কেউ ইদ্দত পালনরত কোনো নারীকে বিয়ে করে, আর উভয়েই ইদ্দত সম্পর্কে এবং এ সময়ে বিয়ে হারাম এ বিষয়টি জানে, তারপর তার সাথে সহবাস করে, তবে তারা উভয়েই যিনাকারী হিসেবে গণ্য হবে; তাদের ওপর যিনার শাস্তি প্রযোজ্য হবে। ওই নারীর জন্য কোনো মহর প্রাপ্য হবে না এবং তার সাথে বংশ-সম্পর্কও সাব্যস্ত হবে না। আর যদি উভয়েই ইদ্দত সম্পর্কে বা এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে সন্তানের বংশ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, শাস্তি প্রযোজ্য হবে না এবং মহর দেওয়া বাধ্যতামূলক হবে।

আর যদি পুরুষ জানে কিন্তু নারী না জানে, তবে পুরুষের ওপর শাস্তি ও মহর উভয়ই ওয়াজিব হবে, কিন্তু তার সাথে সন্তানের বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। আর যদি নারী জানে কিন্তু পুরুষ না জানে, তবে নারীর ওপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে, তার জন্য কোনো মহর থাকবে না, তবে সন্তানের বংশ-সম্পর্ক পুরুষের সাথে সাব্যস্ত হবে।

এমনটি হওয়ার কারণ হলো, এটি এমন এক বিবাহ, যার বাতিল হওয়ার বিষয়ে সর্বসম্মত মত রয়েছে। তাই এটি মাহরাম নারীদের সাথে বিবাহ করার মতোই (অবৈধ) হিসেবে গণ্য।" *(আল-মুগনী- ৮/১০৩)*

জিজ্ঞাসা (০৭): ***দুইজন মিলে ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করা অবস্থায় যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি জামা'আতে শামিল হয় তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি কোথায় দাঁড়াবে অথবা ইমামকে কি সামনে তার ইমামতির স্থানে সালাতরত অবস্থায় চলে যেতে হবে?*** *শাহিনুর ইসলাম*
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

জবাব: যদি দুইজন ব্যক্তি জামা'আতে সালাত পড়ে এবং তারা (ইমামের সাথে) একসাথে দাঁড়ায়, এরপর তৃতীয় ব্যক্তি আসে তাহলে প্রথম মুক্তাদী (যে আগে থেকে ইমামের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল) পিছিয়ে যাবে, যাতে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে ইমামের পেছনে একটি কাতার করতে পারে, যদি পেছনে যথেষ্ট জায়গা থাকে। *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায়: রিকাক, হা. ৭৪০৬, জাবির [রাযিয়াল্লা-হু আনহু]'র দীর্ঘ হাদীস এবং আবুল ইয়াসার এর ঘটনা)* আর যদি ইমামের পেছনে জায়গা না থাকে, তাহলে ইমাম নিজেই সামনে এগিয়ে যাবে (যাতে তাদের জন্য কাতার করা সম্ভব হয়)। *(লিকাআইল বাবিল মাফতূহ লিল উসাইমিন- ১৬/১১)*

জিজ্ঞাসা (০৮): ***ফজরের আযানের কতটুকু সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করলে আওয়াল ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *হারুনুর রশীদ*
বেলগাছি ঈদগাপাড়া, চুয়াডাঙ্গা।

জবাব: ফজরের সালাতের "আওয়াল ওয়াক্ত" নির্ধারণের ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে নির্দিষ্ট করে "আযানের পর এত মিনিট" বলে কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি; বরং মূল মানদণ্ড হলো, সালাত তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় করা।

রাসূল (ﷺ) সারা জীবন ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করেছেন। শুধুমাত্র মাত্র ২ বার ব্যতীত। তাই ফর্সা করে আদায় করা অনুত্তোম কাজ।

দলিল: 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারতো না। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৮)* তাই ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করা যায় ততই ভালো।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***আমি সূরা আল-ফালা-ক্ব, সূরা আন-না-স পড়ে ডান কাত হয়ে ঘুমায়, কিন্তু ঘুমের মধ্যে চিল্লিয়ে উঠি –এর করণীয় কি হতে পারে?*** *আবূ ইসহাক, ঢাকা।*

জবাব: রাতে ঘুমানোর সময় ওযূ করে, সূরা আল-ইখলা-স, আল-ফালা-ক্ব ও আন্-না-স ৩ বার করে পড়ে যতটুকু সম্ভব সমস্ত শরীর মাসাহ করবেন। এরপর ঘুমানোর আরো যে দু'আগুলো আছে তা পড়ার চেষ্টা করুন। সূরা আস্-সাজদাহ্ ও সূরা আল-মুল্ক এবং সূরা আল-বাক্বারাহ্'র শেষ ২ আয়াত ও ২৫৫ নং আয়াত (আয়াতুল কুরসি) পাঠ করে ডান কাতে ঘুমান। ঘুমানোর সময় মোবাইল ব্যবহার ও অন্যান্য চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন। এসবের পরেও সমস্যা হলে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ঝাড়ফুঁক করে তাদের সহযোগিতা নিন, সর্বশেষ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

জিজ্ঞাসা (১০): ***নামাযের প্রথম রাকাতে ভুলবশত সূরা আন্-না-স (কুরআনের সর্বশেষ সূরা) পড়ে ফেললে দ্বিতীয় রাকআতে করণীয় কী? নামাযে সূরা পড়াতে কি ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব: সালাতে সূরার ধারাবাহিক রক্ষা করা উত্তম তবে জরুরি বা আবশ্যক না। কেননা রাসূল (ﷺ) একবার তাহাজ্জুদের সালাতে সূরা আল-বাক্বারাহ্'র পরে সূরা আন্-নিসা, এরপরে সূরা আ-লি-'ইমরান তিলাওয়াত করেছেন। *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায়: মুসাফিরদের সালাত, শিরোনাম: রাতের সালাতে কিরআত দীর্ঘ করা মুস্তাহাব, হা. ১৬৯৯)*

আপনি প্রথম রাকআতে সূরা আন্-নিসা পড়ে ফেললে ২য় রাকআতে সম্ভব হলে সূরা আল-বাক্বারাহ্ থেকে পড়বেন, আর সম্ভব না হলে যেকোনো স্থান থেকে পড়তে পাড়বেন

ইন্ শা-আল্লাহ। এজন্য সাহু সাজদাহ্ দিতে হবে না। *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ- ১৬/৪)*

জিজ্ঞাসা (১১): ***বিমানে বা বাসে যাতায়াতের সময় নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে কী করতে হবে?*** *কাউসার বিন হুসাইন, নীলফামারী।*

জবাব: বিমানে বা বাসে যাতায়াতের সময় সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন:

১. যোহরের ওয়াক্তে যোহরের সাথে আসরকে বা আসরের ওয়াক্তে 'আসরের সাথে যোহরকে মিলিয়ে পড়ুন। অনুরূপভাবে মাগরিবের ওয়াক্তে মাগরিবের সাথে 'ইশাকে বা 'ইশার ওয়াক্তে 'ইশার সাথে মাগরিবকে একত্রে আদায় করুন।

২. 'আসরকে মাগরিবের সাথে ও ফজরকে সূর্য ওঠার পরে আদায় করা যাবে না। তাই গাড়ি থেকে নেমে 'আসর বা ফজর সময়মত আদায় করা সম্ভব না হলে গাড়িতেই ইশারার মাধ্যমে আদায় করতে হবে। ওযূ না থাকলে তায়াম্মুম করে, কিবলামুখী হওয়ার চেষ্টা করবে যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করেই সালাত সময়মত আদায় করতে হবে। কোনোভাবেই সময় অতিবাহিত করা যাবে না। তবে এগুলো আগে স্থলভাগের বাহন হলে আগে চালককে বলে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করতে হবে, যদি রাজি না হয় তাহলো পূর্বোক্ত নিয়মে সালাত আদায় করবে। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬; সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬; ইসলামী শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং ৪৮১৪৫৭)*

জিজ্ঞাসা (১২): ***জামা'আতে সলাত আদায়কালে ইমাম যখন রুকূ' থেকে উঠার জন্য 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলে তখন মুক্তাদি হিসেবে আমি কি রব্বানা লাকাল হামদ বলবো? নাকি সামিআল্লাহুলিমান হামিদা বলে তারপর রব্বানা লাকাল হামদ বলবো? বিস্তারিত জানাবেন?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব: বিশুদ্ধ মতে, আপনি শুধু রব্বানা লাকাল হামদ বা এ জাতীয় যে দু'আ আছে তা পড়বেন। সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলবেন না। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেন,

"إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ.

নবী (ﷺ) বলেছেন: ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন তিনি রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৪)*

তবে একাকী সালাতেও ইমাম উভয়টি বললেন। *(লিকাআইল বাবিল মাফতূহ লিল উসাইমিন- ১/৩২০)*

জিজ্ঞাসা (১৩): ***বর্তমান সময়ে শেয়ার বাজারে টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা এবং সেখান থেকে অর্জিত লভ্যাংশ (Dividend) গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী? কোন ধরনের কোম্পানির শেয়ার কেনা জায়িয এবং কোনগুলো নাজায়িয?*** *আব্দুল মজিদ, নারায়ণগঞ্জ।*

জবাব: বর্তমান সময়ে শেয়ার বাজারে টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা এবং সেখান থেকে অর্জিত লভ্যাংশ (Dividend) গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে, যদি উক্ত কোম্পানির ব্যবসা হালাল হয় ও ইসলামী নিয়মে ব্যবসা করে তাহলে বিনিয়োগে ও লভ্যাংশ গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি হারাম ব্যবসা হয় বা হালাল পদ্ধতিতে ব্যবসা না করে তাহলে বিনিয়োগ করা ও লভ্যাংশ গ্রহণ করা হারাম হবে। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৭৫)*

যে সকল কোম্পানি হালাল ব্যবসা ইসলামী নিয়মে সম্পাদন করে তাদের শেয়ার কেনা যাবে। পক্ষান্তরে যারা হারাম ব্যবসা করে বা হালাল ব্যবসা ইসলামী নিয়মে করে না তাদের শেয়ার কেনা যাবে না।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***একজন মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে অন্য কোনো সুস্থ বা মৃত ব্যক্তির অঙ্গ (যেমন- কিডনি, চোখ বা কলিজা) প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে ইসলামের ফাতাওয়া কী? এক্ষেত্রে অঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় করা কি জায়িয?***

সালমান মুক্তাদির, নাটোর।

জবাব: জীবিত ব্যক্তির অঙ্গদান (অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দান) এক ধরনের নয়; বরং এর দু'টি স্তর রয়েছে– **১.** এমন অঙ্গ দান, যার উপর মানুষের জীবন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল; **২.** এমন অঙ্গ দান, যার উপর জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

যদি এমন অঙ্গ দান করা হয় যার উপর জীবন নির্ভরশীল যেমন- হৃদপিণ্ড বা যকৃত (লিভার) তাহলে তা দান করা বৈধ নয়; বরং এতে সমস্ত আলেম একমত; কারণ এটি আত্মহত্যা বা প্রাণনাশের সমান।

আর যদি এমন অঙ্গ হয় যার উপর জীবন নির্ভর করে না যেমন- কিডনি বা কিছু রক্তনালী তাহলে সমকালীন আলেমগণ এ বিষয়ে দু'টি মত দিয়েছেন, **প্রথম মত:** মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন (নকল বা স্থানান্তর) করা জায়িয নয়। **দ্বিতীয় মত:** মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা জায়িয।

এ বিষয়ে (অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বৈধতা সম্পর্কে) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ফিকহ একাডেমি, সংস্থা ও ফাতাওয়া কমিটির পক্ষ থেকে বৈধতার ফাতাওয়া জারি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন, মাজমা' ফিকহি ইসলামী (Islamic Fiqh Academy) (অধিকাংশ সদস্যের মত অনুযায়ী)।

হাইআতু কিবারিল উলামা (Saudi Council of Senior Scholars), জর্ডান, কুয়েত, মিশর ও আলজেরিয়ার ফাতাওয়া কমিটিগুলো। এটি বহু আলেম ও গবেষকদেরও মত, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রাহিমাহুল্লা-হ)। *(আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: শাইখ মুহাম্মাদ আল-মুখতার আশ-শানকিতি রচিত বই "আহকামুল জিরাহাতিত তিব্বিয়্যাহ" [চিকিৎসা সার্জারির বিধান]- পৃ. ৩৫৪-৩৯১)*

মৃত ব্যক্তির অঙ্গ দানের বিধান: মৃত্যুর পর অঙ্গ দান করা তিনটি শর্ত সাপেক্ষে জায়িয। যথা-

১. দানকৃত অঙ্গ যেন বংশধারা, বংশগত বৈশিষ্ট্য (জেনেটিক বৈশিষ্ট্য) বা ব্যক্তিত্বের উপর কোনো প্রভাব না ফেলে। যেমন- অণ্ডকোষ (testis), ডিম্বাশয় (ovary) বা স্নায়ুতন্ত্রের কোষ (nerve cells) ইত্যাদি। এ বিষয়টি মাজমা' ফিকহি ইসলামী (Islamic Fiqh Academy)-এর সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (এটা জীবিত ও মৃত উভয় সময় প্রযোজ্য)।

২. দাতা (যিনি অঙ্গ দান করবেন) সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হতে হবে অর্থাৎ- তিনি প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগ), বিবেকবান (আকিল) এবং সুস্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতে হবে বা তার ওয়ারিশরা দান করবে বা রাষ্ট্র সরকার বিশেষ অবস্থায় এটার অনুমতি দান করবে।

৩. যার জন্য অঙ্গ দান করা হবে, তাকে মুসলিম বা শান্তিচুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হতে হবে। এমন অমুসলিম হওয়া যাবে না যার সাথে যুদ্ধ বৈধ। *(ইসলামী শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং ২৬৬৭১১, ১০৭৬৯০)* তবে কোনো অবস্থাতেই অঙ্গ বিক্রি করা বৈধ নয়। এমনকি মাথার চুল, রক্ত বা অন্য কোনো অঙ্গ।

তবে যার দরকার তিনি যদি বিনিময় ছাড়া না পান তাহলে কি বিনিময় দিয়ে কিনতে পারবেন?

এটা আরো ভাবার বিষয়। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমি বিত্‌রের নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।*** *শাফিন শাহ নেওয়াজ রশিদ*
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জবাব: বিত্‌র সালাত আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো– সর্বনিম্ন বিত্‌র এক রাকআত। নবী (ﷺ) বলেছেন: "বিত্‌র হলো রাতের শেষে এক রাকআত।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৫২)*

আরো বলেছেন: "রাতের সালাত দুই রাকআত করে। যখন তোমাদের কেউ ফজরের আশঙ্কা করে, তখন এক রাকআত পড়ে তা দিয়ে পূর্বের সালাতগুলোকে বিত্‌র করে নেয়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯১১; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৯)*

তাই কেউ যদি শুধু এক রাকআত পড়ে, তবুও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

দলিল: আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিত্‌র সালাত অপরিহার্য। সুতরাং কেউ ইচ্ছে হলে পাঁচ রাকআত আদায় করবে, কেউ তিন রাকআত আদায় করতে চাইলে সে তাই করবে এবং কেউ এক রাকআত বিত্‌র আদায় করতে চাইলে সে এক রাকআত আদায় করবে। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪২৩, সহীহ)*

উক্ত হাদীস ও অন্যান্য হাদীসের আলোকে, বিত্‌র পড়া যায়: ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ রাকআত। ৩ রাকআত বিত্‌রের পদ্ধতি ২টি এবং উভয়টিই শরিয়তসম্মত।

প্রথম পদ্ধতি: তিন রাকআত একসাথে (টানা) আদায় করবে এবং শুধু শেষ রাকআতে একবার তাশাহ্‌হুদে বসে সালাম ফিরাতে।

দলিল: 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী (ﷺ) বিত্‌রের দুই রাকআতে সালাম দিতেন না।"

অন্য বর্ণনায় আছে– "তিনি তিন রাকআত বিত্‌র পড়তেন এবং শুধু শেষ রাকআত ছাড়া অন্য কোথাও বসতেন না।" *(সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী- হা. ১৪০৪; সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাক্বী- হা. ৪৮০৩)*

ইমাম নব্বী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: এই হাদীসটি নাসায়ী হাসান সনদে এবং বাইহাক্বী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। *(আল মাজমু'- ৪/৭)*

দ্বিতীয় পদ্ধতি: প্রথমে দুই রাকআত পড়ে সালাম দেবে, তারপর আলাদা করে এক রাকআত বিত্‌র পড়বে।

দলিল: 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার জোড়া রাকআত ও বিতরের মাঝে সালাম দিয়ে পৃথক করতেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে নবী (ﷺ)-ও এমনটাই করতেন। *(সহীহ ইবনু হিব্বান- ২৪৩৫)* ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এর সনদ শক্তিশালী। *(ফাতহুল বারী)*

আর যদি কেউ ৫ বা ৭ রাকআত বিতর পড়ে, তাহলে তা একসাথে (টানা) আদায় করবে এবং শুধু শেষ রাকআতে একবার তাশাহ্‌হুদে বসবে, তারপর সালাম দিবে।

দলিল: 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) রাতে তের রাকআত সালাত আদায় করতেন। তন্মধ্যে তিনি পাঁচ রাকআত বিত্‌র আদায় করতেন, এ পাঁচ রাকআতে কেবল শেষ বৈঠক ছাড়া মাঝখানে বসতেন না, অতঃপর সালাম ফিরাতেন। *(আবূ দাউদ- ১৩৩৮)*

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন "নবী (ﷺ) পাঁচ ও সাত রাকআত বিত্র পড়তেন এবং এগুলোর মাঝে সালাম বা কোনো কথার দ্বারা পৃথক করতেন না (অর্থাৎ- টানা পড়তেন)।" *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৬৪৮৬; সুনান আন-নাসায়ী- হা. ১৭১৪, ইমাম নববী [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন: এর সনদ ভালো; আল ফাতহুর রব্বানী- ২/২৯৭ এবং শাইখ আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ] এটিকে সহীহ বলেছেন সহীহ আন-নাসায়ীতে)*

আর যদি কেউ ৯ রাকআত বিত্র পড়ে, তাহলে তা একসাথে (টানা) আদায় করবে। ৮ম রাকআতে বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, কিন্তু সালাম ফিরাবে না; বরং উঠে দাঁড়াবে। এরপর ৯ম রাকআত পড়বে, তারপর বসে তাশাহ্হুদ, যিক্র ও দু'আ করবে, এরপর সালাম দিবে।

দলিল: 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, "নবী (ﷺ) ৯ রাকআত সালাত পড়তেন। তিনি এর মধ্যে ৮ম রাকআত ছাড়া কোথাও বসতেন না। সে রাকআতে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন ও দু'আ করতেন, তারপর দাঁড়িয়ে যেতেন, সালাম ফিরাতেন না। এরপর ৯ম রাক'আত পড়তেন, তারপর বসে আল্লাহকে স্মরণ, প্রশংসা ও দু'আ করতেন, এরপর এমনভাবে সালাম দিতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৬)*

আর যদি কেউ ১১ রাকআত বিত্র পড়ে, তাহলে প্রতি দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে, শেষে এক রাকআত আলাদা পড়ে বিত্র পড়বে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আমাদের দেশে মাগরিবের মতো করে যেভাবে বিত্র পড়া হয় তা সুন্নাহ পরিপন্থী।

কেননা রাসূল (ﷺ) মাগরিবের মতো করে বিত্র পড়তে নিষেধ করেছেন। *(সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাক্বী- হা. ৪৮১৫)*

জিজ্ঞাসা (১৬): ***এক ইমাম মুসল্লিদের যোহরের নামায শেষে, কিবলামুখী থাকা অবস্থায় প্রশ্ন করলেন, নামায কত রাকআত হয়েছে? মুসল্লিরা উত্তর দিলেন হুজুর ৩ রাকআত হয়েছে, সাথে সাথে ইমাম তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বাকি এক রাকআত নামায পড়ে সাহু সিজদাহ্ করলেন, মুসল্লিরাও এভাবে ইমামের সাথে ৪ রাকআত সম্পন্ন করলেন। এই নামায কি সহীহ হয়েছে?***

শাহরান রহমান, গুলশান।

জবাব: জ্বি, সহীহ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। রাসূল (ﷺ)-এর জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) আমাদের নিয়ে যোহর বা 'আস্রের সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া আল্লাহর রাসূল! সালাত কি কম হয়ে গেল? নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি আরো দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। পরে দু'টি সিজদাহ্ করলেন। সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রাহিমাহুল্লাহ)-কে দেখেছি, তিনি মাগরিবের দু' রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে দু'টি সাজদাহ্ করলেন এবং বললেন, নবী (ﷺ) এ রকম করেছেন। *(বুখারী- ১২২৭)*

ইমাম বুখারী শিরোনাম বেঁধেছেন: দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকআতে সালাম ফিরিয়ে নিলে সালাতের সিজদার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ দু'টি সিজদাহ্ করা এবং তিনি উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমাদের দেশে সম্পূর্ণ সালাত আবার ফিরিয়ে আদায় করা হয় যা রাসূল (ﷺ)-এর 'আমলের পরিপন্থী।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***আমার পিতা যাকাত বা ওশর না দিলে আমি তার খাবার খেতে পারবো কী? যে ফসলের ওশর দেয়নি সেটা খেলে কী আমার হারাম খাওয়া হবে? আমার খুব বেশি ইনকাম নেই যে একা খাবো?*** *আবু হেনা মণ্ডল*

ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া।

জবাব: আমরা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আপনার পিতাকে হিদায়াত দান করেন এবং তার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন এবং আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি তার প্রতি নসীহত (উপদেশ) দেওয়া অব্যাহত রাখুন এবং তার হিদায়াত থেকে কখনো নিরাশ হবেন না এবং যাকাত বা উশর আদায় না করার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে থাকবেন। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন –আমীন।

পরকথা, তার খাবার খাওয়া এবং তার সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়াতে আপনার কোনো গুনাহ নেই।

কারণ: যাকাত তার নিজের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত, এটি তার উপর একটি ঋণস্বরূপ, যা আদায় না করা পর্যন্ত সে দায়মুক্ত হবে না। *(ইসলাম ওয়েব- প্রশ্ন নং ১০৫১৬০)*

জিজ্ঞাসা (১৮): ***আমি ইন্সুরেন্স কোং থেকে একটা পলিসি নিতে চাই। যে কারণে নিতে চাই: আমি যতটুকু দেখেছি এরা কমিটেড, বিগত সমস্ত ক্লেইম যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এরা শরীয়াহ বোর্ড অনুযায়ী চলে। এদের শরীয়াহ বোর্ডের নির্দেশনায় বিনিয়োগ পরিচালিত হয়। আমি জানতে চাই ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কি ইন্সুরেন্স পলিসি নেওয়া যায়?***

মো. শফিকুল ইসলাম, কেরানিগঞ্জ।

জবাব: ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী সাধারণ (commercial) insurance পলিসি নেওয়া সাধারণভাবে জায়িয নয়, কারণ এতে কয়েকটি মৌলিক শরঈ সমস্যা আছে। জমহুর

আলেমের মতে প্রচলিত ইন্সুরেন্সে মূলত তিনটি শরঈ সমস্যা থাকে। যথা-

১. গারার (অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা): আপনি টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু কখন/কত পাবেন তা অনিশ্চিত। ইসলাম ধোঁকাপূর্ণ লেনদেন হারাম করেছে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৫১৩)*

২. মাইসির (জুয়া-সদৃশ ঝুঁকি): কখনো কম দিয়ে বেশি পাওয়া যায়, কখনো কিছুই পাওয়া যায় না। এটা জুয়া-জাতীয় কাঠামোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটাও হারাম। *(সূরা আল-মায়িদাহ: ৯০)*

৩. রিবা (সুদ): অনেক ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও লেনদেন যুক্ত থাকে। আর সুদ ইসলামে হারাম। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)* এছাড়াও আরো অনেক সমস্যার কারণে মাজমা' ফিকহি ইসলামী (Islamic Fiqh Academy) এবং হাইআতু কিবারিল উলামা (Saudi Council of Senior Scholars)-সহ অধিকাংশ ফিকহ সংস্থা এটিকে নাজায়িয বলেছেন।

জিজ্ঞাসা (১৯): ***আমাদের একটি সমিতি আছে, আমরা ১০০+ সদস্য আছি। সমিতির বয়স দুই বছর চলতেছে। আলহামদুলিল্লাহ টুকটাক ব্যবসা বাণিজ্য করে কিছু লাভও আছে, কিন্তু কার কত টাকা লাভ আছে তা অনির্দিষ্ট, কারণ অধিকাংশ ব্যবসা চলমান আছে। সমিতির মেয়াদ করা হয়েছে ৩ বছর, এর আগে কেউ বের হতে পারবে না। কিন্তু কিছু সদস্য তাদের নামগুলো বিক্রি করে সমিতি থেকে বের হতে চাচ্ছে। আমাদের সমিতির কোনো স্থাবর সম্পত্তি নেই। এখন যদি আমরা নামগুলো বিক্রি করি তাহলে কিভাবে করতে পারব ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কতটুকু জায়িয বা নাজায়িয হবে দয়া করে জানাবেন!***

ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, ফেনী সদর, ফেনী।

জবাব: ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক শুধুমাত্র নাম বিক্রি বৈধ হবে না। কেননা নামের বিপরীতে কত সম্পদ আছে তা অনির্দিষ্ট তাই এখানে অনেক বেশি ধোঁকা আছে। আর ইসলাম ধোঁকা পূর্ণ লেনদেন হারাম করেছে। *(মুসলিম- ১৫১৩)* তবে যদি আপনারা আপনাদের সমিতির শেয়ার নির্দিষ্টভাবে মূল্যায়ন করে (বর্তমান সম্পদ + লাভ-ক্ষতি হিসাব করে) "net value" নির্ধারণ করতে পারেন তাহলে তা বিক্রি করা বৈধ হবে ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা এখন এটা ধোঁকা মুক্ত।

জিজ্ঞাসা (২০): ***আমি যিলক্বাদ মাসের ফযীলাত জানতে চাই ও এ মাসের বিশেষ করণীয়কি কিছু আছে?***

হাম্মাদ, বগুড়া।

জবাব: যিলক্বাদ মাস মহান আল্লাহর সম্মানিত ৪টি মাসের একটি ও হজ্জের ৩টি মাসেরও ১টি আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন- তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" *(সূরা আত্-তাওবাহ: ৩৬)*

নবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-ক্বা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহার্‌রাম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযারা যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৯৭)*

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ মাসটি মর্যাদাপূর্ণ মাস তাই এ মাসসহ সম্মানিত মাসসমূহে সকল প্রকার হারাম থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এ মাংসগুলোতে হারাম কাজের পাপ বেশি হবে। যিলক্বাদ মাসের বিশেষ কোনো 'ইবাদত নেই, তবে নিজেকে হারাম থেকে বিরত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (২১): ***আমি একজন ব্যবসায়ী। প্রতি বছর সরকারকে আমারে আয়কর (ট্যাক্স) প্রদান করতে হয়। একই সাথে আমার উপর যাকাত, উশরও ফর্‌য হয়। প্রশ্ন হলো– সরকারকে যে কর (ট্যাক্স) প্রদান করা হয়, সেই করের পরিমাণ কি যাকাতের টাকার সাথে সমন্বয় করে বা যাকাত থেকে কেটে রাখা বৈধ হবে? ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এ বিষয়ে সঠিক বিধান কী?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব: না, সঠিক হবে না। কেননা যাকাত আদায় করতে হয় 'ইবাদতের নিয়তে আর ট্যাক্স আদায় করতে হয় রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে মহান আল্লাহর 'ইবাদতের নিয়তে নয়। তাই সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে তা যাকাতের সাথে সমন্বয় করা ঠিক হবে না।

তবে সরকারি যাকাত ফান্ডে যাকাত প্রদান করলে সেই সমপরিমাণ অর্থের ওপর আয়কর (Income Tax) মওকুফ পাওয়া যায় যা রাষ্ট্রীয় নিয়ম।

সুতরাং একসাথে দু'টির কোনো একটি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আপনাকে সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত আদায় করতে হবে, তাহলে সরকারী ট্যাক্স থেকে মুক্তি পাবেন।

জিজ্ঞাসা (২২): ***বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা না বাম দিয়ে বের হবো?*** *ওমর ফারুক, বগুড়া।*

জবাব: শরিয়তের মূলনীতি হচ্ছে, প্রত্যেক ভালো কাজ ডান দিয়ে শুরু করা। **দলিল:** 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৬৮)*

বাড়িতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কোন পা দিবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল পাওয়া যায় না।

সুতরাং যেকোনো একটা করলে কোনো সমস্যা হবে না ইন্ শা-আল্লাহ। যদিও কিছু আলেম প্রবেশ ও বের উভয় সময় ডান পা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। *(শারহু মুখতাসার খলিল- ১/১৪৫)*

জিজ্ঞাসা (২৩): ***ঘোড়া দিয়ে কি কোরবানী করা জায়িয?*** *ইসমাঈল, সিলেট।*

জবাব: ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করা জায়িয নয়। কেননা তা بهيمة الأنعام তথা গৃহপালিত পশু দুম্বা, ছাগল, গরু, উটের অন্তর্ভুক্ত না, যা আল্লাহ সূরা আল-আন'আম-এর ১৪৩-১৪৪ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

"আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 'মানসাক'-এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেসবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।" *(সূরা আল-হাজ্জ: ৩৪)*

জিজ্ঞাসা (২৪): ***প্রশিক্ষিত কুকুর বিক্রি করা যাবে কি? দলিলসহ জানতে চাই।*** *মো. সা'দ, শনিরআখরা, ঢাকা।*

জবাব: কুকুর বিক্রি করা জায়িয নেই। **দলিল:** আবূ মাস'ঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী- ২২৩৭)*

আলেমদের বিশুদ্ধ মতে প্রশিক্ষিত কুকুরও বিক্রি বৈধ না। ইবনু হাজার বলেন, (উপরোক্ত হাদীসে) "নিষেধের বাহ্যিক অর্থ হলো কুকুর বিক্রি করা হারাম। এই হুকুমটি সাধারণ অর্থাৎ- প্রশিক্ষিত (শিকারি) কুকুর হোক বা অন্য কোনো কুকুর, যেগুলো রাখা বৈধ বা অবৈধ, সব ধরনের কুকুরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। *(ফাতহুল বারী- ৪/৪২৬)*

এটাই সঠিক মত। কেননা প্রশিক্ষিত কুকুর বিক্রি বৈধতার পক্ষে যে দলিল পাওয়া যায় তা দূর্বল। *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪২৯৫, যদিও আলবানী [রহিমাহুল্লাহ] সহীহ বলেছেন)*

ইমাম নব্বী বলেন, "কুকুরের মূল্য (বিক্রয়মূল্য) গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তবে শিকারি কুকুর ব্যতীত। এ মর্মে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এক বর্ণনা যে 'উসমান ইবনু আফফান এক ব্যক্তিকে তার হত্যা করা কুকুরের বিনিময়ে বিশটি উট জরিমানা করেছিলেন এবং 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনে 'আস থেকে কুকুর ধ্বংস করলে ক্ষতিপূরণের কথা বর্ণিত হয়েছে, এসব সবগুলোই মুহাদ্দিসদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী দুর্বল (য'ঈফ) হাদীস।" *(শরহ মুসলিম- ১০/২৩৩)*

জিজ্ঞাসা (২৫): ***বাজারে বিভিন্ন ধরনের রঙিন পাখি বিক্রি করা হয় যা খাওয়া হয় না; বরং আনন্দের জন্য কিনা হয়। এর বিধান জানতে চাই।*** *রিমা আক্তার, জুরাইন, ঢাকা।*

জবাব: এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা হারামের দলিল পাওয়া যায় না।

"শৌখিন পাখি যেমন- টিয়া, বিভিন্ন রঙিন পাখি ও বুলবুলি এসব তাদের সুন্দর ডাক ও রূপের জন্য বিক্রি করা জায়িয। কারণ এগুলোর দিকে তাকানো এবং তাদের আওয়াজ শোনা, এটি একটি বৈধ উদ্দেশ্য। শরীয়তে এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বা লালন-পালন হারাম এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় না; বরং এমন প্রমাণ এসেছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, পাখিকে আটক করে পালন করা বৈধ, যদি তাকে খাবার-পানি দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হয়। **দলিল:** আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন: হে আবূ 'উমায়র! কেমন আছে তোমার নুগায়র? *(বুখারী- ৬১২৯)*

ইবনু হাজার বলেন, "এ হাদীসে রয়েছে, ছোট শিশুর পাখি নিয়ে খেলা করা জায়িয; শিশুর বিনোদনের জন্য বৈধ বিষয়ের পেছনে অর্থ ব্যয় করাও জায়িয। পাখিকে খাঁচায় বা অনুরূপ স্থানে রাখা জায়িয এবং পাখির ডানা কেটে দেওয়া জায়িয। অনুরূপভাবে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী বলেছেন: 'এক নারী একটি বিড়ালকে আটকে রাখার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, সে তাকে না খাবার দিয়েছে, না পানি দিয়েছে, আর না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেতে পারে। *(বুখারী- ৭৪৫)*

অতএব, যখন বিড়ালের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য, তখন অন্যান্য পাখির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ রচনা:

বালাদিল আমীন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আবু ফাইয়ায জি. রহমান

ইসলামী পরিভাষায় "বালাদিল আমীন" একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। কুরআনে এই শব্দের মাধ্যমে যে নগরীর কথা বলা হয়েছে, তা হলো পবিত্র মক্কা নগরী। তবে এর তাৎপর্য কেবল একটি ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি আদর্শ নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক।

কুরআনের আলোকে বালাদিল আমীন: আল্লাহ তা'আলা সূরা আত্-তীনে ইরশাদ করেন,

﴿وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾

"এবং এই নিরাপদ নগরীর শপথ।"[১৪৪]

এই আয়াতে "বালাদিল আমীন" বলতে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে মক্কা মুকাররামাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই নগরীকে "নিরাপদ" বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ- এখানে মানবীয় আইন নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর। অন্য আয়াতে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আর মাধ্যমে এর ভিত্তি আরও স্পষ্ট হয়:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

"হে আমার রব! এই নগরীকে নিরাপদ করুন।"[১৪৫]

এ থেকে বোঝা যায়, মক্কার নিরাপত্তা মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনারে একটি অংশ, যা নবী ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সহীহ হাদীসের আলোকে মর্যাদা ও নিরাপত্তা: নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মক্কার পবিত্রতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে– "আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করার দিন থেকেই মক্কাকে হারাম (পবিত্র ও নিরাপদ) করেছেন।" তিনি আরো বলেছেন, "মক্কায় কাঁটা পর্যন্ত কাটা যাবে না, সেখানে শিকার তাড়ানোও যাবে না।"

এই নির্দেশনাগুলো প্রমাণ করে যে মক্কা কেবল একটি শহর নয়; বরং একটি বিশেষ নিরাপত্তা বলয়ে আবদ্ধ পবিত্র অঞ্চল, যেখানে সহিংসতা ও অন্যায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কেবল শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজগুলো এখানে নিষিদ্ধ নয়; বরং এমন কিছু বৈধ কাজও রয়েছে যা বালাদিল আমীন তথা মক্কার এই পবিত্র সীমারেখায় নিষিদ্ধ।

সিরাতের আলোকে বাস্তব রূপ: সিরাত গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায়, ইসলামপূর্ব যুগেও মক্কার একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। যদিও তখন সামাজিক অবিচার বিদ্যমান ছিল, তবুও "হারাম শরীফ" হিসেবে এর নিরাপত্তা স্বীকৃত ছিল।

পরবর্তীতে ফাতহে মক্কার ঐতিহাসিক ঘটনায় এই নিরাপত্তার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা দেন, "আজ তোমাদের প্রতি কোনো প্রতিশোধ নেই।"

এই ঘোষণা শুধু রাজনৈতিক বিজয় নয়; বরং ক্ষমা, সহনশীলতা ও নিরাপত্তাভিত্তিক একটি নতুন সমাজব্যবস্থার সূচনা।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে "বালাদিল আমীন" কেবল একটি ভৌগোলিক পরিচয় নয়; বরং এটি একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রতীক, যেখানে মানবজীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং নৈতিক-আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ একসঙ্গে বিকশিত হয়। এই আদর্শ ব্যবস্থার ভিত্তি মূলত তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

১. নিরাপত্তা– সর্বজনীন সুরক্ষার নিশ্চয়তা: একটি "বালাদিল আমীন" সমাজের প্রথম শর্ত হলো সর্বজনীন নিরাপত্তা। এখানে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। কেউ যেন অন্যায়ভাবে কারো জীবন হুমকির মুখে ফেলতে না পারে, কারো সম্পদ যেন জোরপূর্বক বা প্রতারণার

[১৪৪] *সূরা আত্-তীন: ৩।*
[১৪৫] *সূরা ইব্‌রা-হীম: ৩৫।*

মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া না হয় এবং কারো ব্যক্তিগত সম্মান যেন অবমাননার শিকার না হয়- এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই নিরাপত্তার কাঠামো গড়ে ওঠে। ফলে সমাজে ভয় বা অনিশ্চয়তার পরিবর্তে আস্থা, স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. ন্যায়বিচার– শক্তির নয়, নীতির শাসনঃ এই সমাজব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার। এখানে শাসনব্যবস্থা শক্তি, প্রভাব বা ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না; বরং ন্যায় ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ- আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য; দুর্বল হোক বা শক্তিশালী, ধনী হোক বা দরিদ্র। বিচার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা নয়। ফলে সমাজে পক্ষপাত, বৈষম্য ও যুল্‌মের সুযোগ কমে আসে এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয়।

৩. নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাঃ "বালাদিল আমীন"-এর তৃতীয় স্তম্ভ হলো নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা। এই ব্যবস্থায় বাহ্যিক আইন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও আল্লাহভীতি। মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সততা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে এমন একটি মানসিকতা তৈরি হয়, যেখানে মানুষ কেবল আইনের ভয়ে নয়; বরং নৈতিক সচেতনতা ও আধ্যাত্মিক জবাবদিহিতার অনুভূতি থেকে সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়।

সব মিলিয়ে "বালাদিল আমীন" একটি এমন সমাজের চিত্র তুলে ধরে, যেখানে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক সভ্যতা গড়ে তোলে।

উপসংহারঃ "বালাদিল আমীন" কেবল মক্কার পরিচয় নয়; এটি একটি চিরন্তন আদর্শ। কুরআন, হাদীস ও সিরাত একত্রে আমাদের সামনে এমন একটি সমাজচিত্র তুলে ধরে, যেখানে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে।

বর্তমান বিশ্বে সংঘাত, অনিরাপত্তা ও অবিচারের প্রেক্ষাপটে "বালাদিল আমীন"-এর শিক্ষা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এটি শুধু ইতিহাস নয়; বরং একটি আদর্শ সভ্যতার রূপরেখা- যা মানবজাতিকে শান্তি ও স্থিতিশীলতার দিকে আহ্বান জানায়।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্যতম সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্জ মোহাম্মদ জাকির হোসেন সিংগাপুরের একটি হাসপাতালে অপারেশন-পরবর্তী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও পূর্ণ সুস্থতা কামনায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে আন্তরিকভাবে দু'আ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা সকল মুসলিম ভাই-বোনের নিকট তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে শিফায়ে কামিলা আজিলা দান করেন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক-এর ভগ্নিপতি আমজাদ হোসেন (রাহিমাহুল্লা-হু) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ২৬ এপ্রিল (রবিবার) ঢাকার একটি হাসপাতালে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন, কবরকে প্রশস্ত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষে গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

২. ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন খানের ছোট ভাই শওকত হোসেন খান ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ২৭ এপ্রিল (সোমবার) ভোর ৪ ঘটিকায় ঢাকার বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন, জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং শোকাহত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত